প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

- **আল কুরআনের আলোকে মানুষ**
  মোহাম্মাদ জাওয়াদ রুদগার
- **মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্ব**
  সাইয়্যেদ আকবার সাইয়্যেদীনিয়া
- **পবিত্র কুরআনে জ্ঞান ও বিবেক প্রসঙ্গ**
  মো. আশিফুর রহমান
- **নৈতিকতা ও কতিপয় মূল্যবান উপদেশ**
  যায়নুল আবেদীন কোরবানী লাহিযী
- **হযরত আলী (আ.)-এর জীবনের স্মরণীয় কিছু বিষয়**
  আল্লামা সাইয়্যেদ মোর্তাজা আসকারী
- **মুসলিম দর্শনে অনাদিত্ব বিষয়ক বিতর্ক**
  ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী
- **ইতিহাস ও মানবিক ক্রমবিকাশ**
  শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মোর্তাজা মোতাহ্হারী
- **ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র : ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ**
  Jamiu Adewumi Oluwatoki

বর্ষ ১, সংখ্যা ২, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১০

প্রত্যাশা • একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক • বর্ষ ১, সংখ্যা ২, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১০ ২

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

আল্লাহ্‌র নামে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ১, সংখ্যা ২,

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১০

সম্পাদক	:	**এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর**
সহযোগী সম্পাদক	:	**ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ**
নির্বাহী সম্পাদক	:	**মো. আশিফুর রহমান**
উপদেষ্টামণ্ডলী	:	মোহাম্মদ মুনীর হুসাইন খান
		মোহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দুস বাদশা
		এস.এম. আশেক ইয়ামিন
প্রকাশক	:	মো. আশিকুর রহমান
প্রকাশকাল	:	আষাঢ়-আশ্বিন ১৪১৭ বাং
		রজব-শাওয়াল ১৪৩১ হি.
		জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১০ ইং
মূল্য	:	৫০ (পঞ্চাশ) টাকা
যোগাযোগের ঠিকানা	:	২৯৯, গাউসুল আযম মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
ই-মেইল	:	prottasha.2010@yahoo.com

Prottasha (Vol. 1, No. 2, July-September, 2010), Editor: A.K.M. Anwarul Kabir; Associate Editor: Dr. Zahiruddin Mahmud; Executive Editor: Md. Asifur Rahman; Advisors: Mohammad Munir Hossain Khan, Mohammad Abdul Quddus Badsha, S.M. Asheque Yamin; Publisher: Md. Ashiqur Rahman; Address: 299, Gausul Azam Market, Nilkhet, Dhaka-1205; E-mail: prottasha.2010@yahoo.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৫

আল কুরআনের আলোকে মানুষ ৭

মোহাম্মাদ জাওয়াদ রুদগার

মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্ব ১৭

সাইয়্যেদ আকবার সাইয়্যেদীনিয়া

পবিত্র কুরআনে জ্ঞান ও বিবেক প্রসঙ্গ ২৭

মো. আশিফুর রহমান

নৈতিকতা ও কতিপয় মূল্যবান উপদেশ ৪৭

যায়নুল আবেদীন কোরবানী লাহিযী

হয়রত আলী (আ.)-এর জীবনের স্মরণীয় কিছু বিষয় ৭৩

আল্লামা সাইয়্যেদ মোর্তাজা আসকারী

মুসলিম দর্শনে অনাদিত্ব বিষয়ক বিতর্ক ৭৯

ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী

ইতিহাস ও মানবিক ক্রমবিকাশ ৯৬

শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মোর্তাজা মোতাহ্হারী

ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র : ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ ১১৫

Jamiu Adewumi Oluwatoki

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Prottasha

A Quarterly Journal of Human Development
Vol. 1, No. 2, July-September, 2010

S`akd ne Bnmsdmsr

Editorial 5

Man in the Light of Quran 7
Mohammad Zawad Rudgar

Divine Representation of Human Being 17
Sayyed Akbar Sayyedinia

Knowledge and Conseince In the Holy Quran 27
Md. Asifur Rahman

Ethics and Some Valuable Advices 47
Zainol Aabideen Qorbani Lahiji

Some Memorable Events in the Life of Hazrat Ali (As.) 73
Allama Sayyed Murtaza Askari

Discussion of Eternality In Muslim Philosophy 79
Dr. Shah Kawthar Mustafa Abululayee

History and Human Evolution 96
Shaheed Ayatullah Murtaza Mutahhari

Conspiracy of the West Against Islam:
Historical Perspective 115
Jamiu Adewumi Oluwatoki

গ্রাহক চাঁদার হার		
	প্রতি কপি	বাৎসরিক
ডাকযোগে (পোস্টাল চার্জ সহ)	৬০ টাকা	২৪০ টাকা

ডাকযোগে পত্রিকা পেতে গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার করে নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে :

মো. আশিফুর রহমান
বাড়ি নং-৪ (পশ্চিম পাশ, নিচতলা), রোড নং-৩, ব্লক- সি, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সম্পাদকীয়

বিশ্বায়ন ও মুসলিম উম্মাহ্‌র দায়িত্ব

উম্মাহ্‌র ধারণাটি ইসলামী সংস্কৃতির একটি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ পরিভাষা এবং মৌলিক বিষয় বলে গণ্য। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও হাদিসে বিভিন্ন উপলক্ষে এ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও কুরআন ও হাদিসে বিভিন্ন অর্থে এ শব্দটি এসেছে, কিন্তু পারিভাষিক অর্থে শব্দটি এমন একদল লোককে বুঝায় যারা তাওহীদের বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে একত্র হয়েছে। সুতরাং এ ধারণা সমবিশ্বাসের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ এক জনগোষ্ঠীর ওপর প্রযোজ্য– যারা ঐ বিশ্বাসের কারণে পরস্পর নৈকট্য অনুভব করে এবং একই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য কাজ করে। মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে যে বিশ্বাসগুলো সাধারণ বলে পরিগণিত তা হল তাওহীদ, শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস। এ তিনটি বিষয়ে যারা বিশ্বাস করে পবিত্র কুরআন তাদেরকে পরস্পর ভাই বলে উল্লেখ করেছে এবং এ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

মানবরচিত বিভিন্ন মতবাদ যেখানে রক্ত, বর্ণ ও জাতিগত সম্পর্ক অথবা ভৌগোলিক অবস্থানকে মানুষের ঐক্যের ভিত্তি বলে গণ্য করেছে সেখানে ইসলাম চিন্তা ও বিশ্বাসগত সম্পর্ককে মানুষের মৌলিক বৈশিষ্ট্য– তথা ঐক্যের মূল হিসাবে গ্রহণ করেছে। যদিও উম্মাহ্‌র এ ধারণা চিন্তাগতভাবে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ব্যবহারিকভাবে তা অসংখ্য প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোতে বিদ্যমান বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সঙ্কট পূর্ব থেকেই এ ধারণা বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছিল। বিগত দু' শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ মুসলিম উম্মাহ্‌র ধারণাকে আরও দুর্বল করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে ও অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে।

বর্তমান সময়ে বিশ্বায়নের ধারণা ও প্রক্রিয়া এ প্রচেষ্টায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। কারণ, বিশ্বায়নের বিষয়টি মুসলিম দেশগুলোকে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। বস্তুবাদী চিন্তা ও সংস্কৃতি-নির্ভর এ দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান প্রজন্মকে দুনিয়ামুখিতা ও আখেরাত বিস্মৃতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। বর্তমানে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বিশ্বায়নের ধারণা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে লিবারেল ডেমোক্রেসির সর্বজনীন প্রয়োগের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ চিন্তাধারা সকল ক্ষেত্রে সীমাহীন স্বাধীনতা ও অসম প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী– যার পরিণতি হল বিশ্বব্যাপী বিশেষ গোষ্ঠীর একচ্ছত্র আধিপত্য ও কর্তৃত্ব। এ বিষয়টি মুসলিম উম্মাহ্‌র মূল লক্ষ্যকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। এ চ্যালেঞ্জ ও সংকট মোকাবিলায় ইসলামের প্রকৃত রূপ অনুধাবন ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষার দিকে প্রত্যাবর্তন অপরিহার্য।

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ্‌র দায়িত্ব হল জাতি, বর্ণ ও মাযহাবগত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে পরস্পর সংঘবদ্ধ হওয়া। এ উদ্দেশ্যে ইসলামের বিভিন্ন মাযহাব ও দলের সাধারণ মৌলিক বিশ্বাসের বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ও গতিশীল রূপ উপস্থাপন এবং ইসলামী ঐক্যের জন্য ক্ষতিকর সকল উপাদান পরিহার অপরিহার্য।

মুসলিম দেশসমূহ তাদের সাধারণ মৌলিক বিষয় ও উম্মাহ্‌র স্বার্থকে সামনে রেখে যোগ্যতাসমূহের সমন্বয় সাধন ও সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহকে ব্যবহার করে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। রবার্ট কক্সের মতে মুসলিম বিশ্ব তাত্ত্বিকভাবে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও উচ্চতর নৈতিক নীতিমালার অধিকারী যা বিশ্বসমাজের সামনে কার্যকর সাংগঠনিক রূপরেখা ও দৃঢ়ভিত্তির সামাজিক কাঠামো উপস্থাপনে সক্ষম। বর্তমান সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল ও যুগের চাহিদা পূরণের উপযোগী ইসলামী চিন্তাধারা, এমনকি বর্তমান বিশ্ব মানবতাকেও নৈতিক ও পরিচয়গত সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারে। মুসলিম দেশসমূহ ইসলামী পরিচয় ও ধর্মীয় চিন্তাধারার ঐক্যকে শক্তিশালী আঞ্চলিক জোট গঠনের ভিত্তি হিসাবে কাজে লাগাতে পারে যা বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব অনেকাংশে হ্রাস করতে পারে। মুসলিম চিন্তাবিদরা ইসলামী রাজনীতি ও অর্থনীতির গতিশীল রূপকে ইসলামের সমৃদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার থেকে ধর্মীয় ধারার গবেষণার (ইজতিহাদ) মাধ্যমে হস্তগত করতে পারেন। মুসলিম বিশ্ব যদি এমন এক জীবনাদর্শ উপস্থাপনে সক্ষম হয় যা বর্তমান সময়ের উপযোগী হওয়ার পাশাপাশি নৈতিক ও মূল্যবোধগত যে বিপর্যয় আধুনিক সমাজে রয়েছে তার জন্য কার্যকর প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার অধিকারী, তবে তা ভবিষ্যৎ মানবতার নির্ভরযোগ্য ভিত্তি বলে পরিগণিত হবে এবং পুঁজিবাদী বিশ্বকে অবসন্নতা থেকে মুক্তি দেবে। সুতরাং বর্তমান মুসলিম গবেষকদের চিন্তা ও গবেষণা এ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আল কুরআনের আলোকে মানুষ

মোহাম্মাদ জাওয়াদ রুদগার*

অনুবাদ : এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আল কুরআনে বর্ণিত প্রকৃত মানুষ পবিত্র জীবনের অধিকারী

আল কুরআনে পবিত্র জীবনের কাঠামো ও রূপ পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রবণতা বা পবিত্র বিশ্বাস নৈতিকতা ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। পবিত্র জীবন এমন এক জীবন যার প্রতিটি দিক ও ক্ষেত্র ঐশী বর্ণ ও গন্ধের অধিকারী এবং ঐশী সত্তার কর্তৃত্ব ও অবিভাবকত্বের ছায়ায় বিকশিত। এরূপ জীবন কল্যাণহীন জ্ঞান, অসৎ ও অনুপযুক্ত কর্ম, অপরিশুদ্ধ জীবনোপকরণ ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। এ জীবন শুধু অজ্ঞতা, আল্লাহ্‌র প্রতি উদাসীনতা, বস্তুপ্রেম ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার বন্ধনমুক্তই নয়; বরং আল্লাহ্‌র স্মরণে জাগ্রত, তাঁর নির্দেশের অনুবর্তী ও পছন্দনীয় কর্ম পালনে তৎপর, নিষিদ্ধ কর্ম বর্জনকারী, হালাল জীবিকা অনুসন্ধানকারী, ওহী ও ঐশী প্রত্যাদেশের নিকট আত্মসমর্পণকারী, খোদা অনুরাগী, বুদ্ধিবৃত্তির যথার্থ ব্যবহারকারী ও আল্লাহ্‌র বান্দাদের সেবায় নিয়োজিত। এ বৈশিষ্ট্যগুলো পবিত্র কুরআনের সূরা মুমিনুন (আয়াত : ১-১০), সূরা ফুরকান (আয়াত : ৬৩-৭২) ও সূরা ফাত্‌হ (আয়াত : ২৯)-এ বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র জীবনের সার কথাটি সূরা ফাতির (আয়াত : ১০)-এ এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

*লেখক ইরানের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

'পবিত্র কথা তাঁর (আল্লাহর) দিকে ঊর্ধ্বগমন করে এবং সৎকর্ম তা ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়।'

সুতরাং পবিত্র জীবনের ভিত্তি হল পবিত্র বিশ্বাস, চরিত্র ও কর্ম। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً

'পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম করবে, নিশ্চয় আমরা তাকে পবিত্র জীবন দ্বারা জীবিত করব।'[১]

পবিত্র কুরআনের চিন্তাধারায় পবিত্র জীবন লাভের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং সকলেই নিখাদ উদ্দীপনা, বিশুদ্ধ চিন্তা, সঠিক জ্ঞান ও সৎকর্মের মাধ্যমে এমন জীবন ও পদ্ধতি হস্তগত করতে পারে। প্রকৃত জীবন হল এরূপ জীবন ও পথ অর্জন করা যা মানুষের অস্তিত্বের সকল দিক ও অংশের ওপর ঐশী কর্তৃত্ব ও অভিভাবকত্বের নির্দেশক সত্তাকে প্রাধান্য দান করবে। অর্থাৎ মানব অস্তিত্বের সার বলে গণ্য তার অভ্যন্তরে বিদ্যমান বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তাকে নিজের পরিচালকরূপে নির্ধারণ করবে। আর তাই এ অভ্যন্তরীণ সত্তাকে জাগ্রত করতে মানুষের সত্তার বাইরে বিদ্যমান ঐশী নির্দেশক বিদ্যমান যার আহ্বানে সাড়া দান মানুষকে পবিত্র জীবন লাভে সহায়তা করে। আর তা হল মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জীবন সঞ্চারিণী বাণী ও আহ্বান, যেমনটি সূরা আনফালের ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَجِيْبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُم

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও যখন তাঁরা তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন যা তোমাদের জীবন দান করে।'

পবিত্র কুরআনের আলোকে আলোকিত মানুষ চিন্তা, বোধ, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, বাক্য, কর্ম, আচরণ, ভঙ্গী, নীরবতা পালন সকল কিছুর ক্ষেত্রে যথার্থ। সে পবিত্র উদ্দেশ্য ও উদ্দীপনা, পবিত্র কথা, পবিত্র কর্ম ও আচরণের অধিকারী। সে পবিত্র ভূমি ও ক্ষেত্র থেকে উপকৃত হয় যেমনটি পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : 'পবিত্র ভূমি তার উদ্ভিজ্জকে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমেই বের করে।'

কুরআনী শিক্ষায় প্রশিক্ষিত মানুষ আল কুরআনের এ আয়াতের দৃষ্টান্ত–'তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ কীভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? পবিত্র কথা পবিত্র বৃক্ষের ন্যায়, যার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত। যা প্রতি মৌসুমে ফলদান করে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।' তার সর্বোত্তম নমুনা হল ঈসা (আ.)-এর এ পবিত্র কথা–'যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি (আল্লাহ্) আমাকে বরকতময় (কল্যাণকর সত্তা) করেছেন।' অর্থাৎ কুরআনের কাঙ্ক্ষিত মানুষ যার শ্রেষ্ঠ নমুনা হলেন নবিগণ তাঁরা তাঁদের আলোকময় অস্তিত্ব দিয়ে সকল যুগ, স্থান ও কালকে সমৃদ্ধ ও আলোকমণ্ডিত করেছেন। অন্য ভাষায় বলা যায়, তাঁদের অস্তিত্ব সময় ও স্থানকে ছাপিয়ে সকল কিছুকে আচ্ছাদিত করেছে। এমন মানুষ চিরন্তনতা ও স্থায়িত্ব লাভ করেছেন এবং বিশ্বের সকল পত্রে তার স্বাক্ষর অঙ্কিত হয়েছে। কারণ, তার মহৎ চিন্তা, বিশ্বাস, উদ্দেশ্য, কর্ম, আচরণ ও নীতি অতি প্রাকৃতিক ঊর্ধ্ব এক জগতের সাথে সম্পর্কিত হয়েছে ও ঐশী নৈকট্য লাভের মাধ্যমে চিরন্তনতা পেয়েছে। আর কেবল এরূপ বস্তুই স্থায়ীভাবে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বলে গণ্য হয়। কুরআনের ভাষায়– 'তোমাদের নিকট যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর নিকট যা আছে (ও গৃহীত হয়) তা-ই স্থায়ী।'

ভারসাম্যকেন্দ্রিকতা

কুরআনে চিত্রিত আদর্শ মানুষ যেমন কখনও বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করে না, তেমনি বাক্য, কর্ম ও আচরণে অযথার্থতার পরিচয় দেয় না; বরং সে ন্যায় চিন্তা-ভাবনার অধিকারী, ন্যায়ের পথ অবলম্বনকারী ও সকল অবস্থায় ন্যায়পন্থী। কুরআনের শিক্ষায় প্রশিক্ষিত মানুষ সর্বজনীন ও সার্বিক চিন্তার অধিকারী, বুদ্ধিবৃত্তিনির্ভর, সুপ্রবৃত্তির ধারক এবং সত্য জ্ঞানের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনাকারী। কুরআনী মানুষ জীবনে কখনও ব্যক্তি, সমষ্টি অথবা পরিবারের বিপরীতে অবস্থান নেয় না। সে আধ্যাত্মিকতাকে কখনও বস্তুর জন্য কুরবানী করে না, দুনিয়াকে আখেরাতের বিপরীতে প্রাধ্যান্য দেয় না, প্রেম ও ভাবাবেগকে বুদ্ধিবৃত্তির পরিপন্থী ক্ষেত্রে ব্যবহার করে না; আবার ব্যক্তি, বস্তু, দুনিয়া, প্রেম ও ভাবাবেগকে তুচ্ছ গণ্য করে উপেক্ষাও করে না; বরং তার জীবনে এ বিষয়গুলো পূর্ণতা ও বিকাশের ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হয়। তাই তা তার জীবনের উৎকর্ষের মাধ্যম ও উপকরণ এবং তার ঐশী যাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ ক্ষেত্রে সে এতদুভয়ের মধ্যে কোন একটিকে গ্রহণে বাধ্য নয়; বরং তার কাছে দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র, বস্তু মানবিক উন্নয়ন ও বিকাশের উপাদান, পরিবার পূর্ণতার সহায়ক, সমাজ পারস্পরিক সহযোগিতা ও মত বিনিময়ের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ক্ষেত্র। অর্থাৎ সমাজ ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক সম্পদসমূহকে পুঞ্জীভূত করে তার সর্বোত্তম ব্যবহারের নিশ্চয়তা দানকারী। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হল প্রতিটি বস্তু ও উপকরণকে তার ন্যায়সঙ্গত প্রক্রিয়ায় ব্যবহার এবং এ ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা।

কুরআন অনুসারী মানুষ পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের দৃষ্টান্তস্বরূপ–'তুমি তোমার হাত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখ না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও কর না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।'[২] অর্থাৎ সে দানের ক্ষেত্রেও মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। যেমন অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে–'এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং তারা এতদুভয়ের মাঝে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।'[৩]

একদিকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সে বঞ্চিত, নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়ে থাকে না এবং কৃচ্ছ্রতা ও যোগ সাধানার ক্ষেত্রে এতটা বাড়াবাড়িতেও রত হয় না যে, দুনিয়ার সকল প্রকার সুখ ও ভোগের উপকরণ বর্জন করবে, অন্যদিকে সে ভোগবিলাসী ও অপব্যয়ী-অনাচারী নয়; বরং সে চিন্তা ও কর্মে সামগ্রিকতার ধারক ও ন্যায়সঙ্গত পন্থা অবলম্বনকারী। এ ধরনের ব্যক্তি সম্পর্কেই পবিত্র কুরআন বলছে :

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ...

'এভাবে আমরা তোমাদের মধ্যপন্থী এক জাতি করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হও...।'[৪]

শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহহারী মুসলিম উম্মাহকে এভাবে চিত্রিত করেছেন :

> 'মুসলিম উম্মাহ ভারসাম্যপূর্ণ এক উম্মত। তাদের ভারসাম্যপূর্ণ হওয়ার কারণ হল ইসলাম একটি সামগ্রিক ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা যা মানবজীবনের সকল দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। এটি তার মধ্যপন্থার নিদর্শন। যদি ইসলাম মানবজীবনের ওপর কার্যকর প্রভাব বিস্তারকারী সকল উপাদানের প্রতি দৃষ্টি না দিত এবং কেবল তার জীবনের কিছু কিছু দিকে বিধান প্রণয়ন করত তবে তা কখনই ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম হত না।'[৫]

আল্লামা তাবাতাবায়ীর ভাষায় :

> 'ইসলাম তার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে বুদ্ধিবৃত্তির ওপর স্থাপন করেছে– আবেগ ও অনুভূতির ওপর নয়। এ কারণেই ইসলামে ধর্মীয় আহ্বান

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

> এমন একটি পর্যায়ক্রমিক পবিত্র বিশ্বাস, উন্নত নৈতিক আচরণবিধি এবং ব্যাবহারিকভাবে প্রয়োগযোগ্য বিধানের সমষ্টি বলে গণ্য যাকে সহজাত প্রকৃতির অধিকারী এবং অলীক কল্পনা-বিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত যে কোন মানুষ তার খোদাপ্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা সত্যায়ন করবে।'[৬]

যেহেতু কুরআনের শিক্ষায় প্রশিক্ষিত মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রত্যক্ষ দর্শনমূলক ইসলাম পরিচিতির অধিকারী এবং সার্বিক ধর্মীয় বোধশক্তিসম্পন্ন সেহেতু কখনই সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যকে আধ্যাত্মিকতার নামে দূরে সরিয়ে দেয় না; আবার আধ্যাত্মিকতাকেও সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য বিসর্জন দেয় না বা সমাজসেবাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ত্যাগ করে না। তাই সে আধ্যাত্মিকতার চর্চার অজুহাতে বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগ, ভালবাসার অনুভূতি ও সামাজিক জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ায় না। আবার বুদ্ধিবৃত্তির কারণে নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধি থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেয় না। কিংবা স্রষ্টার দিকে যাত্রার পথিক হিসেবে রাজনীতির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না, তেমনি রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকার সম্পর্কহীনতার ধুয়া তুলে স্রষ্টামুখি কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে না; বরং সে বিকাশ, ভারসাম্য ও উৎকর্ষকে তার জীবনের আবর্তনের কেন্দ্র ও সারবস্তু জ্ঞান করে। সুতরাং কুরআনের আলোয় আলোকিত মানুষ তার জীবনে পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থানের ভরকেন্দ্রকে কুরআন ও মহানবী (সা.) ও তাঁর পবিত্র বংশধরদের জীবন, কর্ম ও নীতিপদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে স্থাপিত ও সুদৃঢ় করেছে। এ কারণে সে চিন্তা, আচরণ ও কর্মে কখনও বিকৃত চিন্তা, অন্ধবিশ্বাস, পশ্চাৎমুখিতা, কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়াশীলতা দ্বারা প্রভাবিত হয় না; বরং তার ঊর্ধ্বযাত্রা ও পূর্ণতা বুদ্ধিবৃত্তি ও ন্যায়পরায়ণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

দায়িত্বসচেতনতা ও দায়িত্বশীলতা

কুরআনের আলোকে গঠিত আদর্শ মানুষ তার চাওয়া-পাওয়া, প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা, ঝোঁক-প্রবণতা ও পছন্দ-অপছন্দের প্রতি গুরুত্ব দানের চেয়ে কুরআনের শিক্ষার অনুবর্তী হয়ে দায়িত্বসচেতনতা ও দায়িত্বশীলতাকে তার জীবনের ভিত্তি নির্ধারণ করে। অর্থাৎ কুরআনী বিশ্বদৃষ্টি ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টিকারী ও তা পালনে ব্যক্তিকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করে যা তার মধ্যে গতি, কর্মচাঞ্চল্য ও উদ্দীপনার জন্ম দেয়,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সে সাথে তাকে উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য প্রয়োজনীয় উপযোগিতা ও এ পথে বিদ্যমান প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে সাহস ও শক্তি যোগায়। মূলত অনুরূপ মানুষের দীনী প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত এ বাণীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় :

لِيَتَفَقَّهُوْا فِيْ الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

'যাতে তারা দীন সম্বন্ধে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারে এবং (এর মাধ্যমে) তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়।'[৭]

অর্থাৎ তার মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি, ধর্মের প্রতি সংবেদনশীলতা, ধর্মজ্ঞান, ধার্মিকতা, ধর্মীয় দায়িত্ব পালন ও ধর্মীয় মিশন পরিচালনার সমন্বয় সৃষ্টি হয়। আর তার এ সমগ্র কর্মকাণ্ড ও বৈশিষ্ট্যকে নিম্নোক্ত দু' আয়াতে চিত্রায়িত করা হয়েছে :

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْآمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ النَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللهِ...

'তারা (আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ও তাঁর নিকট) ক্ষমা প্রার্থনাকারী, (আল্লাহর) ইবাদতকারী, (ও তাঁর) প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, সৎকাজের নির্দেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা রক্ষাকারী...।'[৮]

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ و الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمؤْمِنَاتِ وَ الْقَانِتِيْنَ وَ الْقَانِتَاتِ وَ الصَّادِقِيْنَ وَ الصَّادِقَاتِ وَ الصَّابِرِيْنَ وَ الصَّابِرَاتِ وَ الْخَاشِعِيْنَ وَ الْخَاشِعَاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقَاتِ وَ الصَّائِمِيْنَ وَ الصَّائِمَاتِ وَ الْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحَافِظَاتِ وَ الذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَّ الذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّ أَجْرًا عَظِيْمًا

'নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ ও

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী– তাদের জন্য আল্লাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।'[৯]

অর্থাৎ কুরআনের কাঙ্ক্ষিত মানুষ এ বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জনের পদক্ষেপ নেবে যাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্বের সকল দিকে আল্লাহ্‌র দাসত্বের প্রতিফলন ঘটাবে। সে শুধু আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই নয়; বরং তার সকল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এ দাসত্বের ছাপ রাখবে। তার দায়িত্ববোধের দিকটি সময়, ক্ষেত্র, স্থান, সুযোগ, আশংকা, ভয় ও আশা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় চিন্তাধারার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। তার কর্মকাণ্ড ঐশী উদ্দেশ্য, চিন্তা, জ্ঞান ও খোদাভীতিকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হবে– অন্য কিছুকে কেন্দ্র করে নয়। অবশ্য সে কর্ম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ামক ও প্রতিবন্ধকতাকে যথাযথ পর্যালোচনা করে অর্থাৎ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সর্বোত্তম নীতি অনুসরণ করে। একদিকে মিশনের প্রচার ও এর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণভাবে সে ঐশী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একমাত্র আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করে ও শুধু তাঁকেই ভয় করে বিধায় নিষ্ঠার সাথে তা সম্পাদন করে,[১০] অন্যদিকে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, ধৈর্য ও দূরদৃষ্টি, জ্ঞান ও উদারতার পরিচয় দেয়। তাই কুরআনের শিক্ষায় প্রশিক্ষিত মানুষ কখনই চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা ও সঠিক ধারণা লাভ ব্যতীত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। তার ঐশী মিশন বাস্তবায়নের পথে পরিচালিত সংগ্রাম ও হিজরতসহ সকল কাজ বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাগত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে এ কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন :

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ

'তুমি বল, এটিই আমার পথ, আমি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করি নিশ্চিত জ্ঞানের ওপর (অবিচল) থেকে, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে তারাও।'[১১]

যে ব্যক্তি কুরআনের আলোকে নিজের জীবন গড়তে চায়, পবিত্র কুরআন তার জন্য উত্তম আদর্শ ও পরিপূর্ণ নমুনা উপস্থাপন করেছে। আর সেই আদর্শ ও নমুনা হলেন আল্লাহ্‌র নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.), যিনি তাঁর সমগ্র জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে দায়িত্ববোধ ভিন্ন কোন চিন্তা করেননি। তিনি তাঁর নবুওয়াত-পূর্ব কৈশোর ও যৌবনে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যেমন এ বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখতেন, তেমনি তাঁর নবুওয়াত-পরবর্তী প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের জীবনে মক্কা ও মদীনা উভয় স্থানে অবস্থানকালে পরিচালিত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শাসন পরিচালনা, জিহাদ, হিজরতসহ সকল কর্মে কেবল তাঁর মিশনের দায়িত্ব নিয়েই চিন্তা করেছেন। তাই মহান আল্লাহ্ এ সকল ক্ষেত্রেই তাঁকে অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করে বলেছেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে উৎকৃষ্ট আদর্শ রয়েছে, তার জন্য যে আল্লাহ ও পরকালে আশা রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।'[১২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের পর তাঁর পবিত্র আহলে বাইত এ মিশনের প্রচার, আল্লাহ্র দীনের প্রতিষ্ঠা, ধর্মীয় মূল্যবোধসমূহ রক্ষা, ঐশী বিধিবিধানের বাস্তবায়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে স্থান ও সময়ের দাবি অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের বিষয়েই শুধু চিন্তা করেছেন। হযরত আলী (আ.) তাঁর পবিত্র জীবনে এ পথে অনেক চড়াই-উৎড়াই পাড়ি দিয়েছেন ও অসংখ্য প্রতিকূলতার মোকাবিলা করেছেন। ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনসহ অন্যান্য ইমামও ইসলামি সমাজ ও ব্যক্তিবর্গের যোগ্যতা, জ্ঞান, ধারণক্ষমতা বিবেচনা করে সময়োপযোগী দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা ইসলাম ও মানবতার দাবি অনুযায়ী স্বীয় কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন।

যেহেতু ইসলামের শক্তিশালী তাত্ত্বিক ভিত্তি রয়েছে, সে সাথে রয়েছে ব্যবহারিক ও কর্মগত বাস্তব নমুনা ও আদর্শ সেহেতু যে কেউ এ তত্ত্বের ওপর নির্ভর করবে এবং ঐ সকল আদর্শকে অনুসরণ করবে সে তার মিশনে সফল হবে। এ নিশ্চয়তা আল্লাহ্ এভাবে দিয়েছেন :

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

'এবং যারা আমাদের জন্য (ও পথে) চেষ্টা-সাধনা করে নিশ্চয়ই আমরা তাদের আমাদের পথসমূহ প্রদর্শন করব। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ উত্তম কর্ম সম্পাদনকারীদের সঙ্গে রয়েছেন।'[১৩]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সুতরাং কুরআনে চিত্রিত মানুষ শুধুই তার মিশন বাস্তবায়ন করা ও তার দয়িত্ব সম্পাদনের চিন্তায় থাকে এবং ইসলামের সামগ্রিক দায়িত্ববোধের তাড়নায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও জীবন নির্বাহের দায়িত্ব পালন করে। তবে এ ক্ষেত্রে নৈতিকতা, প্রজ্ঞা, আধ্যাত্মিকতা, শরীয়তের বিধিবিধান ইত্যাদি বিষয়কে বুদ্ধিমত্তা, সচেতনতা ও দূরদৃষ্টির সাথে যথাযথভাবে কাজে লাগায় এবং দৃঢ়তার সাথে তার জীবনের সকল পর্যায়ে তার প্রতিফলন ঘটায়। এভাবে সে কুরআনের এ আয়াতের দৃষ্টান্ত হয়– 'সুতরাং তুমি এবং ঐ সকল লোক যারা তোমার সঙ্গে (আল্লাহ্‌র দিকে) প্রত্যাবর্তন করছে, যেভাবে তোমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেভাবে (সরল-সুদৃঢ় পথে) অটল থাক'।

তাই কুরআনভিত্তিক যে বিশ্বদৃষ্টি ও মানব-পরিচিতি মানুষ লাভ করে সেটিই তার ধার্মিকতার জ্ঞান ও জ্ঞানভিত্তিক ধর্মীয় জীবনের ভিত্তি ও মানদণ্ড বিবেচিত হয় যা তাকে কোন স্থান ও সময়েই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দান করে না। এ দায়িত্বের প্রকৃতি জ্ঞানগত বা উপাসনাগত, অথবা ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক হোক, কোন অবস্থাতেই সে দায়িত্বমুক্ত নয়। যেহেতু কুরআনের শিক্ষায় প্রশিক্ষিত মানুষ তার ও বিশ্বের সৃষ্টি সত্য ও সুন্দরের ভিত্তিতে হয়েছে বলে জানে, সেহেতু তার পরিশুদ্ধি ও বিকাশের বিষয়টিকে স্বীয় দায়িত্ব পালনের ওপর নির্ভরশীল জ্ঞান করে। আর তাই সে তার সঙ্গে তার সত্তা, তার স্রষ্টা, তার স্বজাতি ও তার সঙ্গে বিশ্বের যে সম্পর্ক রয়েছে তার সংস্কার ও পরিপূর্ণতা দানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এরূপ প্রচেষ্টা চালানোর জন্য আল্লাহ যেমন তাঁর নবীদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন,[১৪] তেমনি নবীদের উত্তরাধিকারী আলেমদের থেকেও অনুরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন।[১৫] এ প্রতিশ্রুতির পরিধি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিকসহ সকল কর্মকাণ্ডকে বেষ্টন করে আছে। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (আ.) তাঁর সহযোগীদের নিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বান্দাদের অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোয় এনেছেন ও তাদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি দান করেছেন।

কুরআনে বর্ণিত আদর্শ মানুষ সকল অবস্থায় তাদের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে ও স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষায় সচেতনতার সামাজিক উপাদানগুলোকে ব্যবহার করে সময়োপযোগী ভূমিকা রাখেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যেহেতু দায়িত্বজ্ঞান ও দায়িত্ব পালনের উদ্দীপনা, যোগ্যতা, উপযোগিতা, সম্ভাবনা, কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয় ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্ন হয় এবং অবস্থানগত কারণেও পার্থক্যের সৃষ্টি হয়, সেহেতু কুরআনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণকারী মানুষ এ উপাদানগুলো সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। অর্থাৎ একদিকে তার ধর্মীয় বিধিবিধান সম্পর্কে অবহিতি, অন্যদিকে তার সমাজ সচেতনতা, যুগ সচেতনতা এবং ক্ষেত্রগত পার্থক্য সম্পর্কে অবহিতি তার দায়িত্বের প্রকৃতি, পদ্ধতি ও প্রয়োগনীতির নির্ধারক এবং এ ক্ষেত্রে সে নিজেকে সকল সময় ঐশী সাহায্য ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী বলে জানে।

(চলবে)

তথ্যসূত্র

১. সূরা নাহল : ৯৭
২. সূরা ইসরা : ২৯
৩. ফুরকান : ৬৭
৪. সূরা বাকারা : ১৪৩
৫. খাতামিয়াত, তেহরান, ইনতেশারাতে সাদরা, ১৩৭৮ ফারসি সাল
৬. ইসলাম ওয়া ইনসানে মুয়াসের, কোম, দাফতারে ইনতেশারাতে ইসলামি প্রকাশনা, ১৩৮২ ফারসি সাল।
৭. সূরা তওবা : ১২২
৮. সূরা তওবা : ১১২
৯. সূরা আহযাব : ৩৫
১০. 'যারা আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ পৌঁছে দেয় এবং তাঁকে ভয় করে ও আল্লাহ্ ব্যতীত তারা কাউকে ভয় করে না। বস্তুত হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।'
১১. সূরা ইউসুফ : ১০৮
১২. সূরা আহযাব : ২১
১৩. সূরা আনকাবুত : ৬৯
১৪. সূরা আহযাব : ৭
১৫. নাহজুল বালাগাহ, খুতবা ৩ (শেষাংশ)

(তেহরান থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'কাবাসাত', ১২তম বর্ষ ২য় সংখ্যা থেকে অনূদিত)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্ব

সাইয়্যেদ আকবার সাইয়্যেদীনিয়া

অনুবাদ : এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর

সার সংক্ষেপ

মানুষের মর্যাদার একটি মূল্যবান দিক হল সে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সর্বজনীন প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছে। হযরত আদম (আ.) সকল মানবীয় মর্যাদার অধিকারী হিসাবে এক্ষেত্রে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছেন। মানুষকে এ প্রতিনিধিত্বের জন্য মনোনয়নের পেছনে যুক্তি হিসাবে মহান আল্লাহ্‌র (পবিত্র) নামসমূহ সম্পর্কে তাঁর অবগতির বিষয়টি পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। ইসলামী জ্ঞানের উৎসসমূহে আল্লাহ্‌র নামসমূহ বলতে অদৃশ্য জগৎ ও তার রহস্যময় ভাণ্ডারই উদ্দেশ্য।

মানুষের এ ঐশী প্রতিনিধিত্ব পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী সর্বত্রই আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রতিনিধিত্বের দৃষ্টিতে তার মধ্যে উপাস্য (ইলাহ্) হওয়া ও নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হওয়া ব্যতীত স্রষ্টার সকল গুণবাচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

পূর্ণ মানব (ইনসানে কামেল) ঐশী প্রতিনিধিত্বের সমুজ্জ্বল নমুনা ও দৃষ্টান্ত হিসাবে আল্লাহ্‌র সুন্দরতম (গুণবাচক) নামসমূহের পূর্ণ প্রকাশস্থল। সে সমগ্র অস্তিত্ব জগতে (বস্তু ও অবস্তু উভয় জগতে) মহান আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি এবং সামগ্রিক শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। সে আল্লাহ্‌র সরাসরি প্রতিনিধি এবং অন্য পূর্ণ মানবরা তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মানুষের ঐশী খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের মূল ভিত্তি হল আল্লাহ্‌র পূর্ণতম নামসমূহ সম্পর্কে তার জ্ঞান ও সেগুলোর প্রকাশস্থল হওয়া। যেহেতু মহান আল্লাহ অসীম এবং তাঁর সকল বৈশিষ্ট্যই অসীম সেহেতু মানুষের এ প্রতিনিধিত্ব লাভ সৃষ্টিজগতে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও অস্তিত্বগত সীমাবদ্ধতার কারণে নয়; বরং যে অস্তিত্ব জগতের ওপর ঐশী মানবের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ধারণের ক্ষেত্রে সেটির (অস্তিত্বজগতের) অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতাই এ ঐশী মানবের প্রতিনিধিত্বের কারণ। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছেন এবং নিরঙ্কুশভাবে প্রকাশিত।

পূর্ণ মানব আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে সমগ্র সৃষ্টিজগতকে অস্তিত্বগত ও বিধানগতভাবে পরিচালনাকারী এবং অবস্তুসত্তাসমূহ (ফেরেশতামণ্ডলী) এবং বস্তুসত্তাসম্পন্ন (বস্তুজগতের) সকল কিছুর শিক্ষক। সে আল্লাহ্‌র মধ্যে বিলীন হওয়ার কারণে নিজে কোন সত্তার অধিকারী নয়। এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র খেলাফত ও প্রতিনিধিত্ব লাভের ক্ষেত্রে স্তরগত পর্যায় রয়েছে। প্রতিটি অস্তিত্ব যতটুকু ঐশী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সে ঐ অবস্থানে রয়েছে।

ভূমিকা

মানুষের প্রকৃত পরিচয় কী তা প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও চিন্তাধারার (মতবাদ) নিকট আলোচনার বিষয় ছিল। ইসলাম পূর্ণতম ধর্ম হিসাবে এ বিষয়টির প্রতি সর্বাধিক দৃষ্টি দিয়েছে ও মানুষের সৃষ্টির রহস্যের পর্দা উন্মোচিত করেছে। ইসলাম মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত এক অস্তিত্ব হিসাবে তুলে ধরেছে। ইতোপূর্বে কোন ধর্মই মানুষের মর্যাদাপূর্ণ এ অবস্থানের বিষয়ে এতটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি দান করেনি।

মানুষ অস্তিত্বগতভাবে দু'টি দিকের অধিকারী যার একটি হল তার ঐশী ও আত্মিক দিক যার মাধ্যমে সে ঐশী প্রতিনিধিত্বের স্থানে পৌঁছায় এবং অপর দিকটি হল বস্তুগত দিক যার মধ্যে মানুষের সকল দুর্বল দিক নিহিত। মানুষের নিম্নস্তরের এ দিকটির কারণেই ফেরেশতারা মানুষ সৃষ্টির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

যদিও মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্বের সত্তাকে বোঝা ও জানা প্রায় অসম্ভব, তদুপরি আমাদের সাধ্যমত এ গোপন সত্য ও গুপ্ত ভাণ্ডারকে[১] উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা উচিত

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যাতে তার প্রকৃত পরিচয় লাভের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌কে চেনা সম্ভব হয় এবং মানুষের প্রকৃত রূপ দর্শনের মধ্যে মহান আল্লাহ্‌কে চেনার নিদর্শনকে খুঁজে পাওয়া যায়, ফলে তা দেখে আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ সম্ভব হয়। মহানবী (সা.) বলেছেন : 'যে নিজেকে চিনতে পেরেছে, নিঃসন্দেহে সে তার প্রভুকে চিনেছে।'[২]

এ পরিচিতি বিভিন্নভাবে অর্জিত হতে পারে। কখনও আমরা মানুষের বস্তুগত রূপের পরিচয় লাভ করতে চাই, আবার কখনও তার আত্মিক ও অবস্তুরূপের পরিচয় লাভের আকাঙ্ক্ষী। এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি মানুষের পরিচয় লাভ এ দৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্ব রাখে যে, এ পরিচিতির মাধ্যমে ঐশী আমানত রক্ষায় দায়িত্বশীল এবং মহান আল্লাহ্‌র নামসমূহের প্রকাশস্থল হওয়া ও স্রষ্টার নিকটতম স্থানে ও সান্নিধ্যে পৌঁছার বিষয়টিকে অনুধাবন করা সম্ভব। এ প্রবন্ধে ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

খলিফা শব্দের আভিধানিক অর্থ

অভিধানে খলিফা হল সে-ই যে কারও পেছনে এসেছে ও স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।[৩] খলিফা শব্দটি 'فعيلة' ওয়ায্‌ন (গঠনরূপ) ধারণ করেছে এবং কর্তৃকারক নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি সাধারণত পূর্ববর্তী কারও স্থলাভিষিক্ত হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, পূর্ববর্তী ব্যক্তি বা সত্তা ধ্বংস বা বিলীন হওয়ার পর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার বিষয়টি ঘটেছে।'[৪]

ঐশী খেলাফতের অর্থ

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্‌ মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে মনোনয়নের ঘোষণা দিয়ে বলেছেন : 'এবং যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদেরকে বললেন : নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত) নিযুক্তকারী। তারা বলল : আপনি কি সেখানে এমন কাউকে নিযুক্ত করবেন যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তো আপনার গুণগান করছি। তিনি বললেন : নিশ্চয় আমি যা জানি তোমরা তা জান না।'

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সুতরাং মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলিফা এবং তাকে এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত ক্ষমতা ও যোগ্যতা দেয়া হয়েছে।

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র স্থলাভিষিক্ত

পবিত্র কুরআনে যে মানুষকে স্থলাভিষিক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে মানুষ কার স্থলাভিষিক্ত তা নিয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মানুষকে জীন জাতির স্থলাভিষিক্ত, কেউ বা ফেরেশতাদের স্থলাভিষিক্ত, কেউ কেউ পূর্ববর্তী মানবজাতির, আবার কেউ কেউ তাকে সকল সৃষ্টির স্থলাভিষিক্ত বলেছেন; কিন্তু পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ ও হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি এবং তার এ মর্যাদার কারণেই ইবলিস তার প্রতি হিংসা করেছিল। মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হওয়ার সপক্ষে পবিত্র কুরআনের সূরা বনি ইসরাইলের 'নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে আরোহণ করিয়েছি এবং তাদেরকে পবিত্র রিয্‌ক (জীবিকা) দান করেছি এবং আমরা যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি'– এ আয়াতটি অন্যতম প্রমাণ।

আমরা পরবর্তীকালে বর্ণনা করব যে, মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্ব ও ঐশী মর্যাদা লাভের প্রকৃত কারণ হল তার আল্লাহ্‌র পবিত্র নামসমূহের রহস্য সম্পর্কে অবহিতি। ফেরেশতাগণ তাদের সকল মর্যাদার বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও এ জ্ঞান অর্জনে অক্ষম ছিলেন এবং একমাত্র হযরত আদম (আ.)-এর শিক্ষায় তাঁরা সে সম্পর্কে অবহিত হন। এ মর্যাদা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার স্থলাভিষিক্তের মধ্যে নেই এবং তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এ ধরনের মর্যাদা লাভ সম্ভব নয়।[৫]

তেমনি যদি 'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্তকারী' আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ ছাড়াও তার পরবর্তী আয়াতগুলোকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে যে, মহান আল্লাহ্‌ নিজের স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি নিযুক্তির কথা বলছেন। কারণ, যদি মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি না হয় তবে ফেরেশতাদের হযরত আদমকে সিজদা করার নির্দেশ দানের কোন অর্থ হয় না। তদুপরি মহান আল্লাহ্‌ মানুষ সৃষ্টির পূর্বে অসংখ্য প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাদের কাউকে সৃষ্টির সময়ই প্রতিনিধি নিযুক্তির কথা বলেননি।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আ.) তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত হন। মহান আল্লাহ্ যখন তাঁকে তাঁর নামসমূহ শিক্ষা দিলেন এবং ফেরেশতারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারলেন তখনই তিনি তাদেরকে সিজদা করার নির্দেশ দিলেন। কারণ, কেবল আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি তাঁর নামসমূহ সম্পর্কে অবহিত হতে সক্ষম ও তাঁর গুণাবলির পূর্ণ প্রকাশস্থল হয়েছেন।

মহান আল্লাহ্ হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি ও তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দেওয়ার মাধ্যমে তাঁকে পৃথিবীতে নিজের স্থলাভিষিক্ত করতে মনস্থ করলেন যাতে তিনি তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলির প্রকাশ ঘটাতে পারেন। আল্লাহ তাঁর নামসমূহ শিক্ষা দানের মাধ্যমে তাঁকে সকল সৃষ্টির ওপর প্রাধান্য দিলেন, পূর্ণ মানবদের সৃষ্টি জগতের ওপর কর্তৃত্ব দান করলেন এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে তাঁদের অনুগত করলেন।

ঐশী প্রতিনিধিত্ব মানবজাতির জন্য নির্দিষ্ট

আলোচ্য আয়াতের খলিফার পদটি কি শুধু হযরত আদম (আ.)-এর জন্য নির্দিষ্ট নাকি অন্যরাও তার অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়ে মুফাস্‌সিরদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। আমরা এখানে এ মতগুলো পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করব :

১. একদল মুফাস্‌সির স্থলাভিষিক্তের পদটি হযরত আদম (আ.)-এর জন্য নির্দিষ্ট বলেছেন। তাঁদের মতে অন্য কেউ এ প্রতিনিধিত্বের অধিকারী নয়।[৬]

২. কারও কারও মতে হযরত আদম (আ.) ছাড়াও অন্যান্য পুণ্যবান মানব ঐশী প্রতিনিধিত্বের অধিকারী।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, সকল পরিশুদ্ধ মুমিন ঐশী প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছেন।

৪. কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে সকল মানুষ, এমনকি কাফের ও মুশরিকরাও ঐশী খেলাফতের অধিকারী।[৭]

৫. কেউ কেউ বলেছেন, এ খেলাফত মানবজাতির জন্য নির্দিষ্ট, তবে প্রত্যেক মানুষই পূর্ণতার যে পর্যায়ে রয়েছে সে অনুপাতে ঐশী প্রতিনিধিত্বের অধিকারী।[৮]

মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্বের মানদণ্ড হল মহান আল্লাহ্‌র সুন্দর নামসমূহের রহস্য সম্পর্কে অবগতি এবং মানুষ তা অর্জনের যোগ্যতা অনুযায়ী পূর্ণতার অধিকারী। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ্‌র নাম সম্পর্কিত জ্ঞানে যত বেশি প্রকৃতস্থ হবে তার মধ্যে তত

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বেশি পূর্ণতা সৃষ্টি হবে। প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ্ পরিচিতির পর্যায় হিসাবে পূর্ণতা বিদ্যমান। যে ব্যক্তি তার ঐশী পরিচিতির জ্ঞানকে বাস্তব রূপ দান করবে ও সুপ্ত অবস্থা থেকে কার্যকর অবস্থায় পরিণত করবে সে আরও পূর্ণতার দিকে ধাবিত হবে এবং ঐশী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেও উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হবে। সুতরাং আল্লাহ্র নামের পরিচিতি ও মানবিক পূর্ণতার পরিবর্তনের সাথে সাথে ঐশী প্রতিনিধিত্বের পর্যায়েও পরিবর্তন ঘটে।

মতসমূহের পর্যালোচনা

প্রথম মত : এ মত অনুযায়ী ঐশী প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি হযরত আদম (আ.)-এর জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু এ মতটি কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা প্রমাণ করব যে, এ পদটি হযরত আদম (আ.)-এর জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং মানবজাতি সার্বিকভাবে এ পদের উপযুক্ত। তবে হযরত আদম (আ.)-কে এ ঐশী মর্যাদার প্রতীক হিসাবে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এ বিষয়ে মহানবী (সা.) বলেন :

> 'যখন মহান আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করলেন তখন আমাকে ও আমার বংশধরকে তার ঔরসে স্থাপন করলেন এবং ফেরেশতাদেরকে আমাদের সম্মানে তাঁকে সিজদা করার নির্দেশ দিলেন। এ সিজদা আল্লাহ্র জন্য ইবাদাত এবং আদমের জন্য সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ছিল এবং তা এ কারণে যে, আমরা তাঁর ঔরসে ছিলাম।'[৯]

প্রথম মতটি নিম্নোক্ত কারণে গ্রহণযোগ্য নয় :

প্রথমত আরবি ব্যাকরণে যখন কোন শব্দ কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হয় তখন তা অব্যাহত অর্থ বহন করে। আলোচ্য আয়াতে 'আমি পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্তকারী' বাক্যে নিযুক্তকরণের বিষয়টি অব্যাহত ইঙ্গিত করছে যা হযরত আদমের পরেও অব্যাহত থাকবে।

দ্বিতীয়ত সূরা হজ্বের ৬৫ নং আয়াতসহ পবিত্র কুরআনের যে সকল আয়াতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পৃথিবীর সকল কিছু মানবজাতির অধীন ও অনুগত করার কথা বলা হয়েছে তাতে সমগ্র মানবজাতিকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কাউকে বিশেষায়িত করা হয়নি এবং মানুষ আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবেই এ অধিকার লাভ করেছে। অনেক হাদীসেও পৃথিবীকে সব মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার কথা বলা হয়েছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তৃতীয়ত মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্বের মানদণ্ড হল আল্লাহ্‌র সুন্দর নামসমূহের পরিচয় জানা এবং এ বিশেষত্ব শুধু হযরত আদম (আ.)-এর জন্য নয়; বরং অন্যান্য মানুষও ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ছায়ায় ঐ নামগুলোকে বক্ষে ধারণ ও কর্মে বাস্তবায়িত করে ঐশী খেলাফতের মর্যাদায় পৌঁছতে পারে।

চতুর্থত সূরা আরাফের 'প্রকৃতপক্ষে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তোমাদের আকৃতি দান করেছিলাম এবং এরপর ফেরেশতাদের আদমকে সিজদা করতে বলেছিলাম'– এ আয়াতে সকল মানুষকে লক্ষ্য করে সম্বোধন থেকে বোঝা যায় ঐ মর্যাদা হযরত আদমের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না এবং তাঁকে মানবজাতির প্রতিনিধি ও আদর্শ হিসাবে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করে সিজদা করতে বলা হয়েছিল।

পঞ্চমত আহলে বাইতের পবিত্র ইমামদের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, পৃথিবী কখনও আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিবিহীন থাকবে না এবং আদমের সন্তানদের মধ্য থেকে নিষ্পাপ ব্যক্তিদের কেউ না কেউ এ প্রতিনিধি হিসাবে থাকবেন। এ থেকে বোঝা যায়, হযরত আদম ব্যতীত অন্যরাও আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত।

এছাড়া কোন কোন হাদীসে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কিত আয়াতের মনোনীত ব্যক্তিরা হযরত আদম (আ.) ও পূর্ণ মানবগণ বলে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেগুলোতে হযরত আদম (আ.) ও অন্যান্য পূর্ণমানবের ঐশী প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি ইশারা করলেও অন্যদের তাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেনি। এ সম্পর্কে আয়াতুল্লাহ্‌ জাওয়াদী আমুলী বলেন :

> 'ঐশী প্রতিনিধিত্বের বিষয়টিকে পূর্ণ মানবদের জন্য নির্ধারিত হওয়ার ধারণাটি বিশ্বের সৃষ্টিগত (তাকভীনী) ও বিধানগত (তাশরীয়ী) ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য না করার কারণে ঘটেছে। কারণ, বিশ্বের বিধি-বিধানগত ব্যবস্থায় খলিফা ও ঐশী প্রতিনিধিত্বের জন্য অনেক শর্ত রাখা হয়েছে, যেমন সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, পবিত্রতা, পাপ থেকে মুক্ত থাকা ইত্যাদি। কিন্তু সৃষ্টিগত ব্যবস্থায় ঐশী প্রতিনিধিত্বের জন্য যা প্রয়োজন তা হল সৃষ্টিশীলতা, আল্লাহ্‌র নামসমূহকে নিজের অভ্যন্তরে প্রতিফলিত করার প্রচ্ছন্ন যোগ্যতা ইত্যাদি। যদিও রক্তপাত, বিশৃংখলা সৃষ্টি,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

> শস্যক্ষেত্র ধ্বংস, জীবজন্তু হত্যা করা ইত্যাদি কর্ম অবশ্যই ঐশী প্রতিনিধিত্বের সাথে অসামঞ্জস্যশীল কাজ। কিন্তু এরূপ কর্ম করা মানুষের অকৃতজ্ঞতা ও নিজের মর্যাদার অসম্মানের পরিচয় বহন করে। তবে তার অর্থ এটা নয় যে, সার্বিকভাবে সকল মানুষের জন্য সৃষ্টিগতভাবে ঐশী প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা নির্ধারিত হয়নি।'[১০]

কেউ কেউ সকল মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্বের বিষয়কে খণ্ডনের জন্য স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের অমিলের বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন। তাদের মতে কেউ কারও প্রতিনিধি হতে হলে তাদের উভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই মিল থাকতে হবে। কিন্তু সকল মানুষের মধ্যে ঐশী পূর্ণতার গুণাবলী সম্পূর্ণ মাত্রায় থাকা সম্ভবপর নয়। তাই যে সকল মানুষের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত পূর্ণতার গুণ রয়েছে যেমন মুমিন ও আত্মসংযমী ব্যক্তিরা তারাও একটি পর্যায় পর্যন্ত ঐশী প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হতে পারেন এবং পূর্ণতম মানুষ আল্লাহ্‌র পূর্ণতম খলিফা ও প্রতিনিধি। এ পূর্ণতম মানুষ আল্লাহ্‌র প্রথম সৃষ্টি বা তাঁর গুণাবলির প্রথম প্রকাশ হিসাবে আবির্ভূত হন।

এ মতের পর্যালোচনায় বলা যায়, ঐশী প্রতিনিধিত্বের বাস্তব নমুনা ও দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত হওয়ার বিষয়টি অন্য মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্বের প্রচ্ছন্ন যোগ্যতার অধিকারী হওয়াকে নাকচ করে না। কারণ, তারা বর্তমানে প্রচ্ছন্ন ক্ষমতার অধিকারী হলেও পরবর্তীকালে ঐশী পূর্ণতার বৈশিষ্ট্যগুলোকে কার্যকর রূপ দিতে পারে। তাদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যটি সুপ্ত আকারে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান বিধায় সৃষ্টিগতভাবে তারা প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন।[১১]

চতুর্থ মতের সমর্থকরা তাঁদের মতের সপক্ষে কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

প্রথমত কোন কোন হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ্‌ ফেরেশতাদের সমবেত করে মানুষের নামাযের ইমামতী করার নির্দেশ দিলে ফেরেশতারা মানুষের ইমাম হতে অস্বীকৃতি জানালেন। এরূপ হাদীস থেকে বলা যায় সকল মানুষ ঐশী প্রতিনিধিত্বের অধিকারী।

তাফসীরে নুরুস সাকালাইনে হযরত জিবরাঈল (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : 'যেদিন থেকে আমরা হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা করার নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি সেদিন থেকে আমরা মানুষের অগ্রগামী হই না।'[১২]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সূরা আরাফের ১১ নং আয়াত যেখানে সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করে হযরত আদমের সিজদার বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে তা থেকে বোঝা যায়, হযরত আদম (আ.) প্রতীকীভাবে মানবজাতির প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

চতুর্থ মতটির সপক্ষে যে বর্ণনাগুলো আনা হয়েছে তা সকল মানুষের জন্য প্রচ্ছন্নভাবে ঐশী প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা রয়েছে বলে প্রমাণ করে এবং এ বিষয়টি যে হযরত আদম (আ.) ও অন্যান্য পূর্ণ মানবদের জন্য সীমাবদ্ধ নয় তাও প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনা করে; কিন্তু কারও জন্যই ঐশী প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি কার্যকর রূপে বাস্তবে রয়েছে তা প্রমাণ করে না।[১৩]

পঞ্চম মত অনুযায়ী মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্বের মানদণ্ড হল ঐশী নামসমূহ সম্পর্কে অবহিতি অর্থাৎ আল্লাহ্‌র খলিফা তাঁর সুন্দর নামসমূহের প্রকাশস্থল। কোন কোন সৃষ্টি আল্লাহ্‌র বিশেষ কিছু নামকে ধারণ করে। তারা আংশিক প্রতিনিধিত্বের অধিকারী। অন্যভাবে বলা যায় ঐশী প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি অস্তিত্বগতভাবে পূর্ণতার সাথে সম্পর্কিত এবং তার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। তার পূর্ণতম পর্যায় পূর্ণতম মানবের জন্য নির্দিষ্ট। অন্যান্য পূর্ণ মানব ও পরিশুদ্ধ ব্যক্তি তাঁর থেকে নিম্নের পর্যায়ে রয়েছেন।

সুতরাং ঐশী খেলাফতের বিষয়টি হযরত আদম (আ.)-এর জন্য নির্দিষ্ট নয় এবং তা অন্যান্য পূর্ণ মানব ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়; বরং সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতিও প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা রাখে; এ বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্নভাবে তাদের সবার মধ্যে বিদ্যমান। তবে প্রত্যেক ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র সুন্দরতম নামসমূহের যতটুকু নিজে ধারণ করেছে ও যতটুকু পূর্ণতা অর্জন করেছে সে বাস্তবে ঐ পর্যায়ের ঐশী প্রতিনিধিত্বের অধিকারী হয়েছে।

(চলবে)

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. মহান আল্লাহ্‌ হাদীসে কুদসীতে বলেন : 'আমি গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম এবং নিজেকে পরিচিত করাতে চাইলাম। তাই জগৎ সৃষ্টি করলাম যাতে আমাকে চিনতে পারে।' (আল্লামা বাকের মাজলিসী, বিহারুল আনওয়ার, ৮৪তম খণ্ড, পৃ. ১৯৮);

২. বিহারুল আনওয়ার, আল্লামা মুহাম্মাদ বাকের মাজলিসী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২, মুয়াসসাসা আল ওয়াফা, বৈরুত, ১৪০৩ হিজরী;

৩. মুফরাদাতু আল্‌ফাজিল কুরআন, রাগেব ইসফাহানী, দারুল কালাম ওয়াদ দারুস সামিয়া, দামেস্ক, ১৪১৬ হিজরী, শব্দমূলের আলোচনা দ্রষ্টব্য;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪. আযওয়াল বায়ান ফি ইযাহিল কুরআন বিল কুরআন, মুহাম্মদ আমিন ইবনে মুহাম্মাদ মুখতার, গবেষণা ও পরিবর্ধন : মুহাম্মদ সালিম, দারুল ইয়াহয়িহা, বৈরুত;

৫. তাসনীম, তাফসীরে কুরআনে কারিম, আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমুলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০, মারকাযে নাশরে ইসরা, কোম, ১৩৮০ ফারসি সাল;

৬. তাফসীরে কাশশাফ, আল্লামা মাহমুদ ইবনে উমর যামাখশারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৪, বৈরুত, দারুল ফিক্‌র, ১৩৯৭ হিজরী; জাওয়ামেয়ুল জামে ফি তাফসীরিল কুরআন, ফাযল ইবনে হাসান আত্ তাবারসী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৬, বৈরুত, দারুল আজওয়া, ১৪০৮ হিজরী; মাজমাউল বায়ান ফি তাফসীরিল কুরআন, আল্লামা তাবারসী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১, বৈরুত, দারুত তুরাস ওয়া মুয়াসসাতুত তারিখ, ১৪১২ হিজরী;

৭. আত তাফসীরুল কাশশাফ, মুহাম্মাদ জাওয়াদ মুগনিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০, দারুল ইল্‌ম লিল মালাইন, বৈরুত, ১৯৯০; তাফসীরুল মানার, মুহাম্মাদ রশিদ রেযা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮, দারুল যিকর, ১৪১৪ হিজরী;

৮. তাসনীম, আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমুলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০; আল মিযান ফি তাফসীরিল কুরআন, আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হুসাইন তাবাতাবায়ী, অনুবাদ : আয়াতুল্লাহ্ মাকারেম শিরাজী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮, বুনিয়াদে এলমী ওয়া ফেকরি আল্লামা তাবাতাবায়ী, ১৩৭০ ফারসি সাল, আল্লামা তাবাতাবায়ী এ মতের সপক্ষে পবিত্র কুরআনের সূরা আরাফ : ৬৮, সূরা ইউনুস : ১৪ এবং নাহল ৬২ নং আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন;

৯. বিহারুল আনওয়ার, আল্লামা মুহাম্মাদ বাকের মাজলিসী, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬, বৈরুত, মুয়াসসেসাতুল ওয়াফা, ১৪০৩ হিজরী;

১০. শায়খ আবদে আলী ইবনে জুমআ আরুসী, হুয়াইজী, নুরুস সাকালাইন, কোম, ইনতিশারাতে ইসমাঈলীয়ান, ১৪১৫ হিজরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১, হাদীস নং ৮০; বাহরানী, সাইয়্যেদ হাশেম, তাফসীরে বুরহান, কোম, ইনতিশারাতে ইসমাঈলীয়ান, ১৪১৭ হিজরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩, হাদীস নং ২;

১১. উসূলে কাফী, আল্লামা কুলাইনী, তেহরান, দারুল কুতুব আল ইসলামিয়া, ১৩৮৮ হিজরী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৮ ও ১৭৯;

১২. তাসনীম, আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমুলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৯;

১৩. প্রাগুক্ত, তাসনীম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬।

(তেহরান থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'কাবাসাত', ১২তম বর্ষ ২য় সংখ্যা থেকে অনূদিত)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পবিত্র কুরআনে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি প্রসঙ্গ

মো. আশিফুর রহমান

ভূমিকা

...قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

...'(হে নবী!) বল, যারা মূর্খ ও যারা বিদ্বান তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।'[১]

মানুষ বুদ্ধিমান বা বিবেকসম্পন্ন প্রাণী। অন্যান্য প্রাণীর সাথে তার মূল পার্থক্যই হল তার জ্ঞানের ব্যবহার। যদি জ্ঞান দিয়ে মানুষকে সজ্জিত করা না হত তা হলে অন্যান্য প্রাণীর সাথে তার কোন পার্থক্যই থাকত না। অন্যান্য প্রাণী যেমন খাদ্য গ্রহণ করে ও বংশ বৃদ্ধি করে, একইভাবে মানুষেরও এর থেকে বেশি কিছু করার থাকত না।

কেবল বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েই মানুষ এত উন্নত হতে পেরেছে। বাবুই পাখি সেই সৃষ্টির শুরু থেকে আজও একইভাবে বাসা তৈরি করে, অন্যদিকে মানুষ চাঁদে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করছে। মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধি ব্যবহারের মাধ্যমে তার জীবন যাপন ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করতে পেরেছে। যদি সে জ্ঞানের ব্যবহার না করত তা হলে তার অবস্থাও অন্যান্য প্রাণীর মতই হত।

আবার মহান আল্লাহ্‌র প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর ইবাদত করে। কিন্তু অন্যান্য সৃষ্টির ইবাদতের সাথে মানুষের ইবাদতের পার্থক্য রয়েছে। মহান আল্লাহ্‌ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এজন্যই যে, সে যেন জ্ঞানবুদ্ধি ব্যবহার করে তার স্রষ্টার পরিচিতি লাভ করার মাধ্যমে ইবাদত করতে পারে। আর তাই মহান আল্লাহ্‌ বার বার মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি ব্যবহার করার জন্য বলেছেন। লক্ষণীয় বিষয়

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যে, অন্যান্য ধর্মের বিপরীতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির ব্যবহারে এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির ব্যবহারে যে বিপুল সংখ্যক নির্দেশনা ইসলাম ধর্মে পাওয়া যায় তা অন্য কোন ধর্মে পাওয়া যায় না। বাইবেলে এমনকি জ্ঞানকে আদি পাপের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কেবল সত্যধর্মের পক্ষেই জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ সম্ভব। কেননা, সত্যে উপনীত হওয়ার মূল প্রক্রিয়াটি হচ্ছে জ্ঞানগত চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো।

পবিত্র কুরআনের নাযিলকৃত প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ্ মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দানের কথা বলেছেন :

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ إِقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَامُ الَّذِيْ عَلَّمَ بَالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

'পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে, পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।'[২]

আবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদিসেও জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে বলা হয়েছে :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয।'[৩]

আরেকটি প্রসিদ্ধ হাদিসে বলা হয়েছে :

اُطْلُبِ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللّهَدِ

'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর।'

পবিত্র কুরআনে 'তারা কি চিন্তা করে না' (أَفَلَا يَتَفَكَّرُوْنَ), 'তারা কি গবেষণা করে না' (أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ), 'তোমরা কি বোঝ না' (أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ), 'তারা কি লক্ষ্য করে না' (أَلَمْ يَرَوْا), 'তারা কি (সৃষ্টি প্রক্রিয়া) অবলোকন করে না' (أَفَلَا يَنْظُرُوْنَ) এমন বাক্য ব্যবহার করে মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আবার কুরআনের কোন কোন স্থানে বলা হয়েছে : 'এতে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান জাতির জন্য' (لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ) অথবা 'অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ বিবৃত করেছি' (فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِّقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ)।

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে অসংখ্য উপমা উপস্থাপন করেছেন এবং এর কারণও তিনি বলে দিয়েছেন যে, যেন মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

...وَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

'...এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।'[৪]

বিবেক-বুদ্ধির ব্যবহার

যারা বিবেক ব্যবহার করে আর যারা বিবেক ব্যবহার করে না তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলছেন :

...قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَ الْبَصِيْرُ...

...'বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান?'...[৫]

যারা বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগায় না, কোনরূপ চিন্তা করে না, গবেষণা করে না তাদেরকে কুরআনে মূক, বধির, অন্ধ ইত্যাদি অভিধায় তিরস্কৃত করা হয়েছে :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

'আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মূক যারা কিছুই উপলব্ধি করে না।'[৬]

আরও বলা হয়েছে :

وَ مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِى الْآخِرَةِ أَعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِيْلًا

'আর যে ব্যক্তি এখানে অন্ধ সে আখিরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।'[৭]

এমনকি তাদের পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট বলা হয়েছে :

...لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا أُولَائِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَائِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

...'তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে, তা দিয়ে দেখে না এবং তাদের কান আছে, তা দিয়ে শোনে না, এরাই পশুর ন্যায়, বরং তারা তার চেয়েও নিকৃষ্ট। তারাই গাফেল।'[৮]

মহান আল্লাহ্ বলছেন :

...فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ

...'বস্তুত চোখ তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।'[৯]

আর তাই চিন্তা-গবেষণা করতে হবে, বিবেকের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে এবং এর মাধ্যমেই ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে সুন্দর করতে হবে।

আল কুরআনে জ্ঞানের প্রতি আহ্বান

স্রষ্টার অস্তিত্ব ও একত্ব প্রমাণে, নবী-রাসূলগণের সত্যতা প্রমাণে, কিয়ামতে পুনরুত্থান প্রমাণে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অসংখ্য যুক্তি উপস্থাপন করে জ্ঞানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত উপস্থাপন করা হল।

স্রষ্টার অস্তিত্ব

মানুষের মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তা হল স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে কি নেই। মহান আল্লাহ বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেওয়ার ব্যাপারে বারবার তাকিদ দিয়েছেন। অসংখ্য আয়াতের মাধ্যমে তিনি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। কোথাও চমৎকার উপমার মাধ্যমে বিষয়টির সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন। মহান আল্লাহ মানুষকে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কেই চিন্তা করার মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপার উপসংহারে পৌঁছতে বলেছেন :

أَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ

'তারা কি অন্যের দ্বারা সৃষ্ট নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা?'[১০]

তিনি সৃষ্টিজগতের অন্যান্য সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করার কথা বলেছেন :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

أَفَلَا يَنْظُرُوْنَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

'তারা কি উটের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কীরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর আসমানের দিকে যে কীরূপে সুউচ্চ করা হয়েছে, আর পর্বতমালার দিকে যে, কীরূপে দাঁড় করানো হয়েছে, আর যমিনকে যে, কীরূপে সম্প্রসারিত করা হয়েছে?'[১১]

তিনি সৃষ্টিজগতের নিয়মশৃঙ্খলা নিয়ে চিন্তা করতে বলেছেন :

إِنَ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَّ تَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, যা মানুষের হিত সাধন করে, তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে বারি বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।'[১২]

স্রষ্টার একত্ব

যখন কারো কাছে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ হয়ে যায় তখন তার কাছে দ্বিতীয় যে প্রশ্নের উদ্ভব হয় তা হল স্রষ্টা কি এক, নাকি একের অধিক। পবিত্র কুরআন এ বিষয়েও চমৎকার যুক্তি উপস্থাপন করেছে। বলা হয়েছে :

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا

'বল, 'যদি তাঁর সাথে আরো উপাস্য থাকত, যেমন তারা বলে, তবে তারা আরশ-অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় অন্বেষণ করত।'[১৩]

আল্লাহ্ একাধিক স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকার পরিণাম সম্পর্কে বিবেককে জাগ্রত করার জন্য বলছেন :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

...لَوْ كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا...

...'যদি এতদুভয়ের মধ্যে (আকাশ ও পৃথিবীতে) আল্লাহ ব্যতীত বহু উপাস্য থাকত তা হলে উভয়ই (আকাশ ও পৃথিবী) ধ্বংস হয়ে যেত'...[১৪]

নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে

মহান আল্লাহ্ নিরর্থক কোন কিছুই সৃষ্টি করেননি। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি উদ্দেশ্যমণ্ডিত। তিনি পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি করে পাঠিয়েছেন এরও উদ্দেশ্য রয়েছে। মানবের পূর্ণতা অর্জনই হল সেই উদ্দেশ্য। তাই এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপায়-উপকরণও তিনি পৃথিবীতে দিয়েছেন। এর অন্যতম হল নবী-রাসূল প্রেরণ যেন মানুষ তাঁদের নিকট থেকে প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা নিয়ে সাফল্য লাভ করতে পারে।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, সৃষ্টিকর্তা মানুষের সব ধরনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত, তবে কেন তিনি তাদেরকে কোন বিষয় জানানো বা কোন বিষয়ে সতর্ক করার কোন পদক্ষেপ নিলেন না? এ প্রশ্নেরই জবাব নিহিত রয়েছে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণের মধ্যে।

প্রকৃতপক্ষেই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, মানুষের জানার ক্ষেত্র সীমিত, তাই কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি তার জন্য কল্যাণকর, কোন্‌টি তার জন্য অকল্যাণকর তার সবকিছুই সে নিজে থেকে জানতে বা বুঝতে পারে না। এক্ষেত্রে সে বিকল্প কোন কিছুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সে চিন্তা করে এমন কোন উৎস থাকতে হবে যে উৎস থেকে মানুষ এ বিষয়গুলো জানতে পারে। আর এমন উৎসই হলেন নবী-রাসূলগণ। আবার মানুষ তার স্বভাবের কারণে অনেক সময় কল্যাণকর বিষয় থেকে দূরে যায় বা তা তার মধ্যে নিস্পৃহতা দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে তাকে এ বিষয়গুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া ও সতর্ক করারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর তাই মহান আল্লাহ্‌ও মানুষের জন্য অনুগ্রহ স্বরূপ ঐশী ব্যক্তিত্বদের পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

...وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ

...'এমন কোন জাতি নেই যেখানে ভীতি প্রদর্শনকারী পাঠানো হয়নি।'[১৫]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আরও বলা হয়েছে :

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

'নিশ্চয়ই আপনি সতর্ককারী এবং প্রতিটি জাতির জন্য পথপ্রদর্শক রয়েছে।'[১৬]

নবী-রাসূলগণ প্রেরণের অন্যতম কারণ হল যেহেতু পৃথিবীর ভাল ও মন্দ কর্মের প্রতিদান পরকালে দেওয়া হবে সেহেতু মানুষ যেন কোন অজুহাত দেখাতে না পারে যে, তারা কিছুই জানত না অথবা তারা অনেক বিষয়ই ভুলে গিয়েছিল। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ...

'আমি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে রাসূল প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলের পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অজুহাত না থাকে।'...[১৭]

হযরত আদম (আ.), নূহ (আ.), ইবরাহীম (আ.), মূসা (আ.), ঈসা (আ.) এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সহ মোট ছাব্বিশ জন নবী সম্পর্কে তিনি পরিচয় দিয়েছেন। যেমন :

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ...

'আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম।'...[১৮]

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسى بِآيَاتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ

'আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলি ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছিলাম।'[১৯]

তবে যে কেউ নবুওয়াত দাবি করলেই যে তাকে মেনে নিতে হবে পবিত্র কুরআন তা সমর্থন করে না। বরং এ ক্ষেত্রেও পবিত্র কুরআন জ্ঞানবুদ্ধি ব্যবহার করতে বলেছে। নবী-রাসূলগণ মোজেজার মাধ্যমে তাঁদের নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করতেন যেটা অন্য কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেকের কাছেই তা যাদুবিদ্যা মনে হতে পারে। কিন্তু মানুষ যদি তার জ্ঞান দিয়ে যাচাই করে তবে তার কাছে এ বিষয়টি প্রমাণ হয়ে যায়। আমরা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে যাদুকরদের মোকাবিলার ঘটনায় এটি দেখতে পাই।[২০]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পবিত্র কুরআন সম্পর্কে

নবী-রাসূল প্রেরণের সাথে সাথে মহান আল্লাহ্ জীবনবিধান সম্বলিত ঐশী গ্রন্থও প্রেরণ করেছেন। যারা স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তারা স্বাভাবিকভাবেই স্রষ্টার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত গ্রন্থকেও অস্বীকার করে। তাই স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণে পবিত্র কুরআনে যেমন বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা করা হয়েছে তেমনি সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ সম্পর্কেও যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। এমনকি মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্যও বিবেক কাজে লাগানোর কথা বলেছেন। তিনি পবিত্র কুরআনের মত কোন রচনা নিয়ে আসার জন্য যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, তার মাধ্যমেই বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিতে বলেছেন যে, এটা মানুষের রচনা নয়। মহান আল্লাহ্ কুরআনের অনুরূপ রচনা করার চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছেন :

فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوْا صَادِقِيْنَ

'তারা যদি সত্যবাদী হয়, তবে এর সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক!'[২১]

এরপর সেই চ্যালেঞ্জকে সহজ করে দিয়ে বলেছেন :

قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

'বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা এর অনুরূপ দশটি সূরা আন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাকে পার ডেকে নাও।'[২২]

সবশেষে মাত্র একটি সূরা রচনা করে আনার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন :

وَ إِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

'আমরা আমাদের বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তোমরা সন্দেহে নিপতিত হও তা হলে এর অনুরূপ একটি সূরা (রচনা করে) নিয়ে আস, আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের অন্যসব সাক্ষীকে আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।'[২৩]

أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِثْلِهِ وَ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

'তারা কি বলে সে এটা রচনা করেছে? বল : তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা (রচনা করে) নিয়ে এস, আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যাকে পার আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।'[২৪]

তিনি এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় কেবল মানুষ নয়, বরং মানুষ ও জ্বিন জাতির সম্মিলিত শক্তির অক্ষমতার কথা তুলে ধরেছেন :

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِ هَذا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

'যদি এই কুরআনের অনুরূপ আনার জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় তবুও তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে না, এমনকি যদি তারা পরস্পরকে সাহায্যও করে।'[২৫]

পরিশেষে তিনি এ ব্যাপারে সতর্ক করছেন :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ

'আর যদি (তা) না পার এবং কখনই পারবে না, তা হলে সেই (দোযখের) আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।'[২৬]

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন যে তিনি ব্যতীত আর কারও পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয় সে সম্পর্কে বলেছেন :

...وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافاً كَثِيْرًا

'...যদি তা (কুরআন) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও নিকট থেকে আসত, তবে তারা তাতে অনেক অসংগতি পেত।'[২৭]

কিয়ামতে পুনরুত্থান সম্পর্কে

পূর্বেও যেমন নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে কিয়ামতকে অস্বীকার করা হত, বর্তমানেও তা করা হচ্ছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ কিয়ামত অস্বীকারকারীদের এসব প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিয়েছেন এবং তা অনুধাবন করার জন্য বলেছেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

فَسَيَقُوْلُوْنَ مَن يُّعِيْدُنَا قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

'তারা বলবে, কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে? বল, তিনিই যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।'[২৮]

فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ

'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ফল সম্পর্কে চিন্তা কর, কীভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর এটাকে পুনর্জীবিত করেন, এভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ, তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[২৯]

وَ يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ ءَإِذَا مَامِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئًا

'মানুষ বলে, 'আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হব?' মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না?'[৩০]

এমনকি মানুষ আজ গবেষণার মাধ্যমে যে বিষয়টি জানতে পেরেছে যে, প্রত্যেক মানুষের হাতের আঙ্গুলের রেখা স্বতন্ত্র সেই স্বতন্ত্র রেখাও আল্লাহ্ কিয়ামতে পুনরুত্থানের সময় সৃষ্টি করতে সক্ষম এটি উল্লেখ করেছেন :

أَ يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَ لَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِيْنَ عَلَى أَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ

'মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারব না? বস্তুত আমি তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।'[৩১]

পবিত্র কুরআনে যুক্তি প্রদর্শনের নমুনা

পবিত্র কুরআন থেকেই আমরা জেনেছি যে, নবী-রাসূলগণ মানুষকে হেদায়েত করার জন্য বারবার বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করতে বলেছেন। কীভাবে জ্ঞান-বুদ্ধি ব্যবহার করে যুক্তি প্রদর্শন করতে হয় তার শিক্ষাও তাঁদের জীবনী থেকে পাওয়া যায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল নমরুদের মোকাবিলায় ইবরাহীম (আ.)-এর যুক্তি প্রদর্শনের ঘটনা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْ حَاجَّ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيِي وَ يُمِيْتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ...

'তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইবরাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইবরাহীম বলল, 'তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান', সে বলল, 'আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই'। ইবরাহীম বলল, 'আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করান, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও তো...।'[৩২]

প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে নমরুদের জীবন দান ও মৃত্যু ঘটানোর বিষয়টি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। যখন নমরুদের সাথে বিতর্কের এক পর্যায়ে ইবরাহীম (আ.) এ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, 'আমার প্রতিপালক জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান', তখন নমরুদও দাবি করে যে, সেও জীবন দান করে ও মৃত্যু ঘটায়। এর প্রমাণ হিসাবে সে এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে ধরে এনে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। জল্লাদ এ হুকুম তাৎক্ষণিকভাবে পালন করে। এরপর সে একজন মৃত্যু দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত অপরাধীকে জেলখানা থেকে ডেকে এনে মুক্ত করে দেয়ার আদেশ দেয়।[৩৩]

ইবরাহীম (আ.) বুঝতে পারলেন যে, নমরুদ জনসাধারণকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে এবং এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বোঝানোর মত পরিস্থিতিও নেই, তাই তিনি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে এমন এক প্রসঙ্গের অবতারণা করেন যাতে নমরুদ কোনরকম ভুল ব্যাখ্যা করার সুযোগ না পায়। তিনি বলেন : 'আমার প্রতিপালক সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় কর'। আর এ যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে তিনি নমরুদকে হতবুদ্ধি করে দেন।

ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের উপাস্যের উপাসনাকারীদের নিকট ইবরাহীম (আ.) যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন সেসবও অতুলনীয়।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَأَ كَوْكَبًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِيْنَ فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هذَا رَبِّيْ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَأَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

الضَّالِّيْنَ فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّيْ بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ

'অতঃপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, 'এটাই আমার প্রতিপালক।' অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না।' অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জ্বলরূপে উদিত হতে দেখল তখন বলল, 'এটা আমার প্রতিপালক।' যখন এটাও অস্তমিত হল তখন বলল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব।' অতঃপর যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হতে দেখল তখন বলল, 'এটা আমার প্রতিপালক, এটা সর্ববৃহৎ।' যখন এটাও অস্তমিত হল, তখন সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র শরীক কর, তার সাথে আমার কোন সংশ্রব নেই।'[৩৪]

এখানে অনেক সময় ভুল বোঝার অবকাশ রয়ে যায় যে, ইবরাহীম (আ.) বোধ হয় সত্যিসত্যি এগুলোকে তাঁর প্রতিপালক মনে করেছিলেন এবং পরে তাঁর বিবেকের কাছে প্রমাণ হয়েছে যে, এরা তাঁর প্রতিপালক হতে পারে না। বিষয়টি এমন নয়। বরং তিনি গ্রহ-নক্ষত্রের পূজারীদের কাছে এসব উপাস্যের দুর্বলতা প্রকাশ করার জন্যই এমনভাবে যুক্তি প্রয়োগ করেছেন যাতে তা তাদের বিবেককে নাড়া দিতে সক্ষম হয়।

পবিত্র কুরআনের সূরা আনআমের ৮৩ নং আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَ تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَى قَوْمِهِ...

'আর এটা আমার যুক্তি-প্রমাণ যা ইবরাহীমকে দিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের মোকাবিলায়...।'

পবিত্র কুরআনে কাফির মুশরিকদের মূর্তির অক্ষমতা বুঝানোর জন্য ইবরাহীম (আ.) যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন সে সম্পর্কে বলা হয়েছে :

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

‘অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল মূর্তিগুলোকে তাদের প্রধান ব্যতীত; যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে। তারা বলল, ‘আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ করল কে? সে নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারী।’[৩৫]

এরপর বলা হয়েছে :

قَالُوْا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيْمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ فَرَجَعُوْا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُوْنَ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُوْنَ قَالَ أَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّ لَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَّكُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

‘তারা বলল, ‘হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ করেছ?’ সে বলল, ‘বরং এদের এই প্রধান, সে-ই তো এটা করেছে, এদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যদি এরা কথা বলতে পারে।’ তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে বলতে লাগল, ‘তোমরাই তো সীমালঙ্ঘনকারী।’ অতঃপর তাদের মাথা অবনত হয়ে গেল এবং তারা বলল, ‘তুমি তো জানই যে, এরা কথা বলে না।’ ইবরাহীম বলল, ‘তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। ধিক্ তোমাদেরকে এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদেরকে। তুবও কি তোমরা বুঝবে না?’[৩৬]

কত চমৎকারভাবে জ্ঞানকে ব্যবহার করেছেন ইবরাহীম (আ.)। আমাদের তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতে হয়।

উপসংহার

ইসলাম জ্ঞানের ধর্ম। ইসলাম যুক্তির ধর্ম। তাই ইসলামের প্রচার কাজও হতে হবে যুক্তিভিত্তিক। আমরা যখন কোন অমুসলিমের কাছে ইসলাম ধর্মকে উপস্থাপন করব তখন অবশ্যই যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে এ ধর্মের সত্যতা তুলে ধরতে হবে। একইভাবে অন্যান্য ধর্মের অসারতাও যুক্তির ভিত্তিতেই প্রমাণ করতে হবে। কুরআন যে সর্বশেষ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ঐশী ধর্মগ্রন্থ তা প্রমাণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) যে সর্বশেষ নবী ও রাসূল এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম যে আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম তাও প্রমাণ করতে হবে। তার কাছে পবিত্র কুরআনের এ দলিল উপস্থাপন করা অর্থহীন যে, যেহেতু মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র গ্রন্থ কুরআনে বলেছেন পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলো বিকৃত হয়ে গেছে, তাই সেসব ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে। বরং এ পুরো প্রক্রিয়ার জন্য স্বতঃসিদ্ধ যুক্তিবুদ্ধির ব্যবহার অপরিহার্য; অন্যথায় ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসীদের নিকট তা অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়বে।

আবার একইভাবে নাস্তিকের কাছে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে হবে। ধর্মবিরোধীরা ধর্ম সম্পর্কে যে সব আপত্তি উত্থাপন করে তার যৌক্তিক জবাব প্রদান করতে হবে। ধর্মহীনতা মানব জীবনে কী ক্ষতিকর প্রভাব রাখে তা ব্যাখ্যা করতে হবে। ধর্মীয় জীবন যাপন মানব সমাজের জন্য যে সব কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে পারে সেগুলো বুঝিয়ে বলতে হবে। অর্থাৎ জ্ঞানের বিকল্প কোন কিছুই এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয়। তাই ধর্মকে যথাযথভাবে প্রত্যেকের কাছে উপস্থাপন করতে হবে যেমনটি পবিত্র কুরআনও নির্দেশ দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে মহান আল্লাহ্ প্রজ্ঞাসহকারে মানুষকে ধর্মের দিকে আহ্বান করতে বলেছেন :

أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ

'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়।'[৩৭]

এতো অমুসলিম ও নাস্তিকদের প্রসঙ্গ। কিন্তু একজন মুসলমানের কাছেও সবকিছু উপস্থাপন করতে হবে যুক্তি দিয়ে। কোন মুসলমান যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে– সেটা হতে পারে আল্লাহ্ সম্পর্কে, হতে পারে নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে অথবা ইসলাম ধর্মের কোন বিধান সম্পর্কে, যেমন উত্তরাধিকার আইন, পুরুষের একের অধিক বিবাহের বিষয় ইত্যাদি।

যদি যথোপযুক্ত জবাব দানের মাধ্যমে তাকে সন্তুষ্ট করা না যায় তবে হয়তো সে তা মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না। যখন সে সঠিক জবাব পেতে ব্যর্থ হবে তখন সে ধর্মের ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলতে পারে। ইসলাম ধর্মের প্রতি তার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে। সে মনে করতে পারে যে, এটি জবর-দস্তিমূলক কোন ধর্ম যেখানে যুক্তিকে অগ্রাহ্য করা হয়, যে ধর্ম জ্ঞানের পরিবর্তে কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয় অথবা এটি অজ্ঞ ও অন্ধ অনুসারীদের ধর্ম।

মানুষের মধ্যে যে সহজাত সত্যান্বেষী মনোবৃত্তি রয়েছে তা অবশ্যই পরিতৃপ্ত করতে হবে। মানুষের মনে প্রশ্ন আসবেই। তাকে ধমক দিয়ে অথবা যেন-তেনভাবে বুঝিয়ে দাবিয়ে রাখা উচিত নয়, বিশেষ করে বর্তমান নাস্তিকতাপূর্ণ পরিবেশে যেখানে ধর্মের বাঁধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

মুসলমানদের মধ্যেও নানা মত ও পথের বিভাজন রয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই সকলের মধ্যেই নিজেকে সঠিক দাবি করার ব্যাপারটি ঘটে থাকে। এ ক্ষেত্রেও সকল মুসলমানের জন্য পবিত্র কুরআনে যে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে সেই বিবেক-বুদ্ধিরই আশ্রয় নেওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যজনক যে, কেউ কেউ এ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে নিষেধ করে থাকেন অথবা নিরুৎসাহিত করেন। যেন তাঁরা কুরআনের নির্দেশনার বিপরীতে আশংকা করেন যে, বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার তাঁদেরকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলতে পারে। আসলে হয় তাঁরা নিজেদের জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু এ ধরনের অমূলক আশংকায় ভোগেন অথবা কোন বিষয়ের প্রতি অন্ধ ভাললাগা বা আনুগত্য এ ধরনের একপেশে অযৌক্তিক মত প্রকাশ করতে তাঁদের বাধ্য করে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগের মানুষের সাথে আজকের যুগের মানুষের কী পার্থক্য? রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওপর যে ওহী নাযিল হয়েছিল এবং যা তিনি তাঁর যুগের মানুষের কাছে সরাসরি মৌখিকভাবে উপস্থাপন করেছেন সে কথাই লিখিত আকারে কুরআন রূপে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। যদি চৌদ্দশ' বছর পূর্বে পবিত্র কুরআন বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের কথা বলে থাকে, তবে আজ কি তার আবেদন নিঃশেষ হয়ে গেছে? কুরআন কি কেবলই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগের জন্য এসেছিল? এর আহ্বান কি কেবল সেই সময়ের মানুষের জন্য ছিল?

প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালালেই মানুষ মহান আল্লাহ্কে চিনতে পারবে, নবী-রাসূলগণকে চিনতে পারবে, জীবনকে কীভাবে গঠন করবে তার দিক নির্দেশনা পাবে, পার্থিব ও পরকালীন জীবনের মুক্তির দিশা পাবে। যদি বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো না হয়, যদি কুরআন নিয়ে গবেষণা না করা হয়,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তা হলে না আল্লাহকে চেনা সম্ভব, না নবী-রাসূলগণকে। মানুষ যেমন পার্থিব জীবনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে, তেমনি পরকালীন অনন্ত জীবনের কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত হবে।

আর যদি আল্লাহ্‌কে চেনা সম্ভব না হয়, তাঁর রাসূল (সা.)-কে চেনা সম্ভব না হয় তাহলে মানুষ নিজেরা যেমন পথভ্রষ্ট হবে, তেমনি অন্যদেরও পথভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দেবে। মক্কার কাফেররা যেমন (নাউযুবিল্লাহ) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কবি, যাদুকর, পাগল বলেছিল, অনেক প্রাচ্যবিদ বিধর্মী লেখক যেমন রাসূলকে মৃগী রুগী, নারীলিপ্সু, যুদ্ধবাজ বলেছে, মুসলমানরাও তেমনি রাসূলকে (নাউযুবিল্লাহ্‌) ভুল-ভ্রান্তির শিকার হওয়া, ধর্মীয় বিধানের ব্যাপারে উদাসীন হওয়া অথবা অন্য কোন দোষে দোষী সাব্যস্ত করবে এবং দুঃখজনকভাবে সত্য হল এটিই যে, আজ মুসলমানদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সঠিক পরিচয় লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর মর্যাদার পরিপন্থী অসংখ্য হাদিসকে অবলীলায় সত্য বলে গ্রহণ করেছে। শুধু তা-ই নয়, প্রতিটি অসত্য হাদিসকে সত্য প্রমাণ করার জন্য নানারূপ অপব্যাখ্যারও আশ্রয় নিয়েছে।

যা হোক পার্থিব যে কোন কিছুকে মানুষ বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করে থাকে। পার্থিব জীবনের নানা কাজ, যেমন পড়ালেখা, জীবিকার ব্যবস্থা করা, বিবাহ, সন্তান গ্রহণ, বাসস্থান তৈরি ইত্যাদি কাজে মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধির যথোপযুক্ত ব্যবহার করার চেষ্টা করে। আর এর সবই করছে পৃথিবীতে মাত্র কয়েক বছরের জীবনকে আরামপ্রদ করার জন্য। অথচ মৃত্যুর পর যে জীবন রয়েছে, সে জীবনের ব্যাপারে বিশ্বাস থাকার পরও সে জীবনকে সুখময় করার জন্য মুসলমানদের মধ্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টার ঘাটতি চরম মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। মৃত্যুর পরের এ জীবনকে সুখময় করার জন্য একমাত্র পথই হল জ্ঞান-বুদ্ধির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সত্যপথ খুঁজে নিয়ে সে পথের অনুসরণ। যদি মৃত্যু-পরবর্তী অনন্তকালের জীবনকে সুখময় করার জন্য জ্ঞানের ব্যবহার করা না হয় তবে কি মহান আল্লাহ কেবল এ ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনে ব্যবহারের জন্যই মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন?

সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোন পথ আছে কি? আর যদি বিষয়টি এমন হয় যে, সকলেই পূর্বপুরুষদের অথবা অন্যান্যের দোহাই দেবে যে, আমি তাঁদের যে পথের ওপর পেয়েছি সে পথই অনুসরণ করেছি, এ ছাড়া

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আমার আর কোন পথ ছিল না। এটা কি নবী-রাসূলগণের যুগের সেই মূর্তিপূজকদের কথা নয় যারা পূর্বপুরুষদের দোহাই দিত? পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে কাফেরদের কথা বার বার বলা হয়েছে যারা পূর্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে রাসূলগণের আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছিল।

হযরত সালেহ (আ.)-এর জাতি তাঁকে বলেছিল :

...أَتَنْهَانَا أَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا...

...'তুমি কি আমাদেরকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করছ, আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের ইবাদত করত?'...[৩৮]

হযরত শুয়াইব (আ.)-এর জাতি এ ব্যাপারে বলেছিল :

...يَا شُعَيْبُ أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَّفْعَلَ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا نَشَاؤُا

...'হে শুয়াইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষরা যার ইবাদত করত আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে অথবা আমরা আমাদের ধনসম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও?'[৩৯]

হযরত মূসা (আ.)-এর জাতি বলেছিল :

أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا

'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যাতে পেয়েছি তুমি কি তা থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করার জন্য আমাদের নিকট এসেছ?'[৪০]

একইভাবে রাসূল (সা.)-কেও কাফেররা একই কথা বলেছিল যা পবিত্র কুরআনে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে :

وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ

'যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর', তারা বলে, 'না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তার অনুসরণ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করব। এমনকি, তাদের পিতৃপুরুষরা যদিও কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎ পথেও পরিচালিত ছিল না, তথাপি।'[৪১]

তা হলে কী পার্থক্য সেদিনের সেই কাফেরদের সাথে আমাদের? আজকের বিধর্মীদের তবে কী দোষ যে, তারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করবে? তারাও তো তাদের পিতৃপুরুষদের তাদের ধর্মের ওপর পেয়েছে। তাই আবার বলতে হয় পবিত্র কুরআনের আবেদন কি তবে নিঃশেষ হয়ে গেছে?

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থের দিকে অবশ্যই মুসলমানদের গভীর মনোযোগ দিতে হবে :

وَ لَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى...

'প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী। কেউ বহন করবে না অন্যের বোঝা।'...[৪২]

তাই প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য হল মহান আল্লাহ্‌র কিতাবের নির্দেশ মান্য করা। সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে নিজের আকীদা নির্ধারণ করা। আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে বিচারবুদ্ধি ব্যবহারের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলগণের পরিচয় লাভ করা এবং কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর নির্দেশিত সঠিক পথ বেছে নিয়ে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির ব্যবস্থা করা। যারা এ কাজ করতে পারবে তারাই মহান আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বুদ্ধিমান। কারণ, মহান আল্লাহ্‌ বলছেন :

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ أُولَائِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمْ اللّٰهُ وَ أُولَائِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

'যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে। তাদেরকে আল্লাহ্‌ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন।'[৪৩]

আর মহান আল্লাহ্‌ তো পবিত্র কুরআনে ওয়াদা করেছেন যে, যাঁরা এজন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করবেন তাঁদের তিনি নিজেই পথ প্রদর্শন করবেন :

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا...

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

'যারা আমাদের উদ্দেশ্যে কঠোর চেষ্টা করে, আমরা তাদের অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব... ।'[৪৪]

তথ্যসূত্র :

১. সূরা যুমার : ৯
২. সূরা আলাক : ১-৫
৩. ইবনে মাজাহ, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২২৪, আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত
৪. সূরা ইবরাহীম : ২৫
৫. সূরা রাদ : ১৬
৬. সূরা আনফাল : ২২
৭. সূরা বনি ইসরাইল : ৭২
৮. সূরা আরাফ : ১৭৯
৯. সূরা হাজ্ব : ৪৬
১০. সূরা তূর : ৩৫
১১. সূরা গাশিয়াহ্ : ১৭-২০
১২. সূরা বাকারা : ১৬৪
১৩. সূরা বনি ইসরাইল : ৪২
১৪. সূরা আম্বিয়া : ২২
১৫. সূরা ফাতির : ২৪
১৬. সূরা রাদ : ৭
১৭. সূরা নিসা : ১৬৫
১৮. সূরা হুদ : ২৫
১৯. সূরা হুদ : ৯৬
২০. সূরা ত্বহা : ৬১-৭৩
২১. সূরা তূর : ৩৪
২২. সূরা হুদ : ১৩
২৩. সূরা বাকারা : ২৩
২৪. সূরা ইউনূস : ৩৮

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২৫. বনি ইসরাইল : ৮৮
২৬. সূরা বাকারা : ২৪
২৭. সূরা নিসা : ৮২
২৮. সূরা বনি ইসরাইল : ৫১
২৯. সূরা রূম : ৫০
৩০. সূরা মারইয়াম : ৬৬-৬৭
৩১. সূরা কিয়ামাহ : ৩-৪
৩২. সূরা বাকারা : ২৫৮
৩৩. কাছাছুল কোরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত
৩৪. সূরা আনআম : ৭৬-৭৮
৩৫. সূরা আম্বিয়া : ৫৮-৫৯
৩৬. সূরা আম্বিয়া : ৬২-৬৭
৩৭. সূরা নাহ্‌ল : ১২৫
৩৮. সূরা হুদ : ৬২
৩৯. সূরা হুদ : ৮৭
৪০. সূরা ইউনূস : ৭৮
৪১. সূরা বাকারা : ১৭০
৪২. সূরা আনআম : ১৬৪
৪৩. সূরা যুমার : ১৮
৪৪. সূরা আনকাবুত : ৬৯

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নৈতিকতা ও কতিপয় মূল্যবান উপদেশ

যায়নুল আবেদীন কোরবানী লাহিযী

অনুবাদ : মো. আশিফুর রহমান

ভূমিকা

মানুষের শরীরের যেমন খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের চাহিদা আছে ঠিক তেমনি তার আত্মারও চাহিদা রয়েছে। আর তা হল নৈতিক ও অন্যান্য শিক্ষার চাহিদা। যে ব্যক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ, যে নৈতিক শিক্ষায় বেড়ে ওঠেনি এবং নোংরা ও অশ্লীল কাজ হতে বিরত থাকে না সে বাহ্যিকভাবে মানুষ হলেও বাস্তবে সে মনুষ্যত্ব থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। আর তাই ইরানের বিখ্যাত কবি হাফিজ বলেন :

> 'মানুষকে সম্মানিত করে তার আত্মা;
> সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ মানুষকে সম্মানিত করে না।
> যদি চোখ, জিহ্বা, কান এবং নাক গঠন করে মানুষকে
> তাহলে কি পার্থক্য মানুষ ও দেয়ালে আঁকা ছবির মধ্যে;
> সত্যিকার মানুষ হও, নতুবা হবে তুমি মানুষের বুলি আওড়ানো একটি পাখি
> যদি তুমি তোমার হিংস্র স্বভাবের করতে পার মূলোৎপাটন
> তবে তুমি যাপন করবে এক মানুষের জীবন।'

এ জন্যই প্রত্যেক নবী-রাসূলের কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল নৈতিকতাপূর্ণ ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের শিক্ষা দান। তাঁরা বিরাজমান পরিবেশ-পরিস্থিতিতে কখনও নিজেরা আচরণের মাধ্যমে, কখনও বক্তৃতা, উপদেশবাণী ইত্যাদির মাধ্যমে নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হলেন মানবজাতির জন্য আদর্শ। পবিত্র কুরআনে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'নিশ্চয়ই রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।'[১]

এক ব্যক্তি হযরত আয়েশার কাছে জিজ্ঞাসা করে : 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চরিত্র কেমন ছিল?' তিনি বলেন : 'তুমি পবিত্র কুরআন পাঠ করনি? পবিত্র কুরআনই রাসূলের চরিত্র।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিক্ষা হল এমনকি শত্রুর সাথেও সৌহার্দপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে তার মনোভাবের পরিবর্তন করা। এক বৃদ্ধা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। একদিন রাসূল কাটা দেখতে না পেয়ে ঐ বৃদ্ধার খোঁজ করলেন। তাঁকে বলা হল যে, বৃদ্ধা অসুস্থ। রাসূল তাকে দেখতে গেলেন এবং তাকে সান্ত্বনা দিলেন। এরপর ঐ বৃদ্ধা মুসলমান হয়ে গেল। এমনই ছিল রাসূলের শিক্ষা। মহান ইমামগণও রাসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনেক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। যারা তাঁদের সম্পর্কে কটু কথা বলত তাদের সাথেও তাঁরা কোমল আচরণ করতেন, তাদের অভাব পূরণ করতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং ইমামগণের অসংখ্য হাদীসে মানুষের চরিত্রগঠনমূলক বিষয়ের বর্ণনা এসেছে। আমরা যদি তাঁদের জীবন এবং বাণীগুলো থেকে শিক্ষা নেই তাহলেই আমরা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারব। এ উন্নত চরিত্র গঠন সংক্রান্ত যে শিক্ষা তাকে আখলাক (اخلاق) বা নীতিশাস্ত্র বলা হয়।

আখলাক (اخلاق)

اَخْلَاقٌ শব্দটি خَلْقٌ বা خُلْقٌ শব্দ থেকে এসেছে। خَلْقٌ (প্রকৃতি বা স্বভাব) ও خُلْقٌ (প্রকৃতি বা চরিত্র) শব্দ দু'টি মূলত একই, কিন্তু خَلْقٌ মানুষের বাহ্যিক কাঠামোকে নির্দেশ করে যা চোখে দেখা যায় যেখানে خُلْقٌ মানুষের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও সহজাত বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে যা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। ইমাম আলী (আ.) বলেছেন : 'خُلْقٌ আত্মার সাথে সম্পর্কিত, যেখানে خَلْقٌ শরীরের সাথে সম্পর্কিত।'

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মানুষের চেহারার মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে– কারও চেহারা সুন্দর, আবার কারও কুৎসিৎ, তেমনি মানুষের আত্মার মধ্যেও পার্থক্য আছে– কোনটা সুন্দর– মানবিক, কোনটা অমানবিক। মানুষের শারীরিক কাঠামো সৃষ্টিগত নিয়মের ওপর নির্ভরশীল। এখানে মানুষের করার কিছু নেই। বিপরীত দিকে আমাদের আচরণ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকাংশই শিক্ষা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে গঠিত হয়।

ইবনে মাসকুয়ী তাঁর 'তাহারাতুল আরাক' গ্রন্থে বলেছেন : 'خُلُقٌ' হল মানুষের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা কোনরূপ চিন্তাভাবনা ছাড়াই মানুষকে তার দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করে।'আর এটি দু' প্রকারের : এর একটি অংশ স্বাভাবিক– যা মানুষের সহজাত। যেমন যখন এক ব্যক্তি কোন তুচ্ছ বিষয়েই ভয়ংকর রূপ ধারণ করে অথবা সামান্য ঘটনায় ভয় পায় অথবা খুশী বা হতাশাগ্রস্ত হয়।

এর অন্য অংশ নির্ভর করে আমাদের অভ্যাস ও অনুশীলনের ওপর। এ অংশ প্রথমে চিন্তার ওপর নির্ভরশীল থাকে; কিন্তু পরবর্তীকালে অনুশীলন এবং পুনপুন করার মাধ্যমে অভ্যাসে পরিণত হয়; তারপর কোনরূপ চিন্তা ছাড়াই কাজ করে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের মধ্যে স্থিরতা লাভ না করে ততক্ষণ তা নৈতিক বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ একটি মানুষ যদি হঠাৎ কোন ভাল বা মহৎ কাজ করে তাহলে তাকে মহৎ বলা যায় না। আবার হঠাৎ বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্যও কাউকে বীর বলা যায় না। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে কেবল তখনই خُلُقٌ বলা যায় যখন তা প্রতিনিয়ত কোন চিন্তাভাবনা ছাড়াই মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা

মানুষের নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। একজন মানুষের প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষার একটি পরিমিত পর্যায় পর্যন্ত উপভোগ করা, অন্যদের সাথে শান্তিতে বসবাস এবং পার্থিব ও পরকালীন উন্নতির জন্য নীতিশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মানব সমাজের উন্নতি এবং অধঃপতন কেবল বিজ্ঞান ও বস্তুগত উন্নতির ওপর নির্ভর করে না; বরং নৈতিকতার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিই মানব সমাজের উন্নতি বা পতনের কারণ। নীতিশাস্ত্র মানব জাতিকে জীবন্ত রাখে, যে গোষ্ঠীর নীতি নেই, তার ধ্বংস অনিবার্য।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নৈতিকতার অভাব মানবসমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলা যায়। নৈতিকতার অভাব ভাল লোকের ভাল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রভাবিত করতে পারে। বিপরীত দিকে নীতি-নৈতিকতা কোন বিপথগামী লোককেও রক্ষা করতে পারে। নীতিশাস্ত্রের প্রয়োজন সকলের– শাসিত কিংবা শাসক, এমনকি নবী-রাসূলগণেরও।

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

'যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে সে-ই সফলকাম, আর যে নিজেকে কলুষিত করে সে ব্যর্থ হয়।'[২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ছিলেন উত্তম চরিত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলছেন :

إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।'[৩]

ইসলামের নৈতিকতা শিক্ষার প্রশংসনীয় দু'টি প্রকৃতি রয়েছে : একটি হল অপ্রকৃত বা গৌণ দিক, অপরটি হল প্রকৃত বা মুখ্য দিক।

নীতিশাস্ত্রের অপ্রকৃত দিকের মধ্যে রয়েছে শারীরিক ও পোশাক-আশাকের পরিচ্ছন্নতা, হাসিখুশী থাকা, অন্যদের সম্মান করা, নম্রভাবে কথা বলা, অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যাওয়া, অহংকার পরিত্যাগ করা, সন্দেহ না করা ইত্যাদি।

কিন্তু নীতিশাস্ত্রের প্রকৃত দিক হল মানবচরিত্রের ঐ সকল বিষয় যেগুলো মানব চরিত্রের সত্যিকার বৈশিষ্ট্য। যেমন মহানুভবতা, ন্যায়পরায়ণতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, বিশ্বস্ততা, মানবতাবোধ ইত্যাদি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নীতিশাস্ত্রের গৌণ বিষয়গুলো যা প্রায় প্রত্যেক মানুষের পক্ষে কম-বেশি অর্জন করা সম্ভব। যদি কেউ চায় যে, এগুলো মেনে চলবে তাহলে অনুশীলনের মাধ্যমে তা করা সহজ। কিন্তু নীতিশাস্ত্রের মুখ্য বিষয়গুলো এবং সর্বোৎকৃষ্ট মানবীয় চরিত্র অর্জন করা খুবই কঠিন। সবাই তা অর্জন করতে পারে না।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কেবল ঐ সব ব্যক্তিই তা অর্জন করতে পারে যারা উন্নত আত্মার অধিকারী, নিজের ওপর যাদের নিয়ন্ত্রণ আছে, যারা মানবীয় রীতি মেনে চলায় অভ্যস্ত এবং মহান আল্লাহ্‌কে মান্য করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মহান ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন :

أَفْضَلُ النَّاسِ إِيْمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلْقاً

'ঈমানের দৃষ্টিতে সর্বোত্তম মানুষ হল তারা যারা সদাচরণের দিক থেকে সর্বোত্তম।'[৪]

রাসূল (সা.) বলেছেন :

بُعِثْتُ لِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

'মহৎ গুণাবলির পূর্ণতার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি।'

আরেকটি হাদীসে এসেছে :

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ

'আমি নৈতিকতাকে পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি।'[৫]

এক ব্যক্তি ইমাম সাদিক (আ.)-কে উত্তম মানবীয় গুণাবলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেন : 'তুমি মানুষকে দয়া করবে, নম্রভাবে কথা বলবে এবং তোমার ভাইয়ের সাথে উত্তম আচরণ করবে।'[৬]

আরেক ব্যক্তি ইমাম সাদিক (আ.)-এর কাছে এসে বলল : 'হে আল্লাহ্‌র রাসূলের সন্তান! আমাকে নৈতিক গুণাবলি সম্পর্কে বলুন।' ইমাম বললেন : 'যে তোমার ওপর জুলুম করেছে তাকে ক্ষমা করবে, যে তোমার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে, তোমার প্রাপ্য থেকে যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে তাকে প্রদান করবে এবং সত্য কথা বলবে যদি তা তোমার বিপক্ষেও হয়।'

সহীফায়ে সাজ্জাদিয়ায় ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) তাঁর দোয়ায়ে 'মাকারিমুল আখলাক'-এ আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছেন : 'হে আল্লাহ্! হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর বংশধরদের ওপর দরুদ ও সালাত প্রেরণ করুন। আমাকে সাহায্য করুন যাতে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যে আমাকে প্রতারিত করেছে তাকে সদুপদেশ দানের মাধ্যমে তার প্রতারণাকে প্রতিরোধ করতে পারি, যে আমাকে ত্যাগ করেছে তার প্রতি সদাচরণের মাধ্যমে এ কর্মের শাস্তি দিতে পারি। যে আমাকে বঞ্চিত করেছে তাকে দানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করতে পারি; যে আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বিষয়টিকে মোকাবিলা করতে পারি; যে আমার গীবত করেছে তার ভাল দিকগুলো স্মরণের মাধ্যমে তার গীবতকে প্রতিরোধ করতে পারি; আমি যেন কল্যাণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি এবং মন্দ থেকে চোখ বন্ধ করতে পারি।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা বিজয়ের পর তাঁর চরম শত্রুকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সিফ্ফীনের যুদ্ধে মুয়াবিয়ার সৈন্যরা ফোরাতের দখল নিয়ে এর পানি ব্যবহার করতে ইমাম আলীর সৈন্যদের বাধা দেয়। ইমাম আলীর সৈন্যরা যখন মুয়াবিয়ার সৈন্যদের সরিয়ে নদীর দখল লাভ করে তখন তাঁর সৈন্যদের কেউ কেউ বলেছিল, আমরাও মুয়াবিয়ার সৈন্যদের পানি নিতে দেব না। কিন্তু ইমাম আলী (আ.) জবাবে বলেন : 'আমরা তাদের ভুলের বিপরীতে দুর্ব্যবহার করব না, আমরা তাদেরকে পানি ব্যবহার করতে বাধা দেব না।'

যখন এক দোকানদার আলী (আ.)-এর সেনাপতি মালিক আশতারের মাথায় আবর্জনা নিক্ষেপ করে, তখন মালিক আশতার মসজিদে চলে যান। তিনি এ ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন।

ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-কে যখন তাঁর এক প্রতিবেশী অপমান করে তখন তিনি তার বাড়িতে যান এবং বলেন : 'যদি তুমি যা বলেছ তা সত্য হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আর তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য না হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ যেন তোমাকে ক্ষমা করেন।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং ইমামগণের এ ঘটনাগুলো উত্তম নৈতিক চরিত্রের কিছু দৃষ্টান্ত।

নীতিশাস্ত্রের অপ্রকৃত বিষয়গুলোর সাথে প্রকৃত বিষয়ের পার্থক্য হল অপ্রকৃত বিষয়গুলো বস্তুগত কল্যাণের মাধ্যম, কিন্তু প্রকৃত বিষয়গুলো আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্জনের সোপান। প্রথমটি আমাদের জীবনকে সুশৃঙ্খল করে, যেখানে পরেরটি আমাদের আত্মাকে উন্নত এবং সন্তুষ্ট করে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মানুষের জীবনে নৈতিক শিক্ষার ভূমিকা

পশুপাখি জন্মের পরই সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমে তার কাজ সম্পর্কে জানে। তাদের কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। যখন মাছের পোনা ডিম ফুটে বের হয় তখন থেকেই জানে কীভাবে সাঁতার কাটতে হবে, কীভাবে খাদ্য খেতে হবে, কীভাবে নিজেকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। তাকে কিছুই শিক্ষা দিতে হয় না।

এনোফিলিস মশা লতা-পাতাভোজী, কিন্তু সদ্য জন্ম নেওয়া বাচ্চার খাবারের জন্য দরকার শুয়োপোকা বা এ রকম কীট। তখন মা মশা এ রকম বিশেষ কীট শিকার করে, একে হুল ফুটিয়ে নিস্তেজ করে। এভাবে সে তার বাচ্চার জন্য টাটকা মাংসের ব্যবস্থা করে। এটা সে করে তার সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমে–কোন শিক্ষার মাধ্যমে নয়। এটা সে অর্জন করেনি।

সহজাত প্রবৃত্তির কারণেই মৌমাছি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে, আশ্রয়স্থল তৈরি করে এবং চাকের প্রতিটি মাছির মধ্যে কাজ বণ্টন করে দেয়।

কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তার প্রতিদিনের কর্তব্য সম্পাদন করা এবং পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য সহজাত প্রবৃত্তি এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বুদ্ধকরণের চেয়েও বেশি কিছু প্রয়োজন। তাছাড়া বিবেকের পাশাপাশি তার দিক-নির্দেশনারও প্রয়োজন রয়েছে।

যদি মানবশিশুকে সাহায্য করা না হত তাহলে হয়তো সে পশুর মত হাঁটত। সে হয়তো বোবা হত যদি তাকে ভাষা শিক্ষা দেওয়া না হত।

মাওলানা রুমী বলেন : 'একজন বধির একজন বোবায় পরিণত হয়; সে-ই বক্তা যে তার মায়ের কাছ থেকে কথা শোনে।'

অতএব, এ পৃথিবীর বাস্তবতা সম্পর্কে বোঝা এবং সৃষ্টির রহস্যাবলি অনুধাবনের জন্য মানুষের একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। একজন শিক্ষক ছাড়া মানুষ এ ধরনের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে অক্ষম।

মানুষের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতার সঠিক ব্যবহারের জন্য, আদর্শে পৌঁছান ও তার চরিত্রের ক্ষতিকর অংশগুলো ছেটে ফেলার জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। যদি আল্লাহ্ নবী-রাসূলদের প্রেরণ না করতেন তাহলে মানুষ কখনই এত উন্নত জীবন যাপন করতে পারত না।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ঈমানদারদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।'[৭]

মহান আল্লাহ্ রাসূলের শিক্ষাকে সত্যিকারের জীবন বলেছেন, আর যারা তা গ্রহণ করবে না তাদেরকে মৃত বলেছেন।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দাও যখন তিনি (রাসূল) তোমাদের আহ্বান করেন এমন বিষয়ের প্রতি যা তোমাদের জীবিত করে।'[৮]

শিক্ষা মানুষের ক্ষমতাকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারে সাহায্য করে। মানুষের সহজাত কিছু যোগ্যতা আছে, যেমন সত্যান্বেষণ, নৈতিক চেতনা, সৌন্দর্যের প্রতি ভালবাসা, স্বাধীন হওয়া, নিজের ভাল বোঝা ইত্যাদির জন্য একজন প্রশিক্ষকের প্রয়োজন যিনি তার এ যোগ্যতাগুলোকে বের করে আনবেন এবং এগুলোকে সঠিক দিকে পরিচালিত করবেন।

জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় শিক্ষাগ্রহণের সম্ভাবনা আছে। জীবজন্তু সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমে তাদের জীবন যাপন করে। এগুলো তাদেরকে একটি সীমিত পর্যায়ের পূর্ণতা দান করে। কিছু সংখ্যক প্রাণী, যেমন কুকুর, ঘোড়া, হাতী, বানর, ডলফিন, শিয়াল ও ভল্লুক অপেক্ষাকৃত উচ্চতর বুদ্ধি ধারণ করে। এদেরকে কোন কিছু খুঁজে বের করা, পশুর পাল রক্ষা করা ও সার্কাসের কাজে ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষিত করা যায় যেগুলো আমরা সিনেমা বা অন্যান্য জায়গায় দেখতে পাই।

কিন্তু প্রাণীদের কাজকর্মের ক্ষেত্র খুবই সীমিত। কারণ, এদের ক্ষমতা মানুষের তুলনায় অনেক কম। এজন্যই আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন তারা কোন গাণিতিক বিষয়ের সমাধান করতে পারবে না, পরমাণুর গঠন বিশ্লেষণ করতে পারবে না,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মহাকাশ যান তৈরি করতে পারবে না, রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ তৈরি করতে পারবে না এবং সার্জিক্যাল অপারেশন করতে পারবে না। একমাত্র মানুষের পক্ষেই সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে এগুলো করা সম্ভব।

জ্ঞান ও প্রবৃত্তি

মানুষের জ্ঞান পশুর প্রবৃত্তির মতই কাজ করে। তবে এ দু'টির মধ্যে অনেক দিক থেকেই পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

১. প্রবৃত্তি এর অধিকারীর সম্মতি ছাড়াই কাজ করে। এর ব্যতিক্রম হয় না। মৌমাছি সবসময় ষড়ভূজাকৃতির চাক তৈরি করে। পিঁপড়া মাটির নিচে তার আবাসস্থলে গমের দানা সবসময় দু'ভাগে ভাগ করে রাখে যাতে অঙ্কুরোদ্গম হতে না পারে। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হওয়ার কারণে মানুষ সবসময় জ্ঞানের অনুবর্তী হয়ে কাজ করে না। পশু সৃষ্টির নিয়ম দ্বারা চালিত হয় এবং এ ক্ষেত্রে তার নিজের সম্মতি অসম্মতির কোন ব্যাপার নেই।

...مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

'...এমন কোন জীব-জন্তু নেই যে তাঁর পূর্ণ অধীন নয়, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে।'[৯]

২. প্রবৃত্তি কোন ভ্রান্তি ছাড়াই একটি কাজ করে, কিন্তু জ্ঞান যখন প্রতিজ্ঞা (premise) থেকে কোন উপসংহারে উপনীত হয় তখন ভুলও করে। পরিবেশ-পরিস্থিতি, পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব, ভুল শিক্ষা, কুসংস্কার, কামনা ও ক্রোধ এবং এরকম আরো অনেক বিষয়ের আমাদের জ্ঞানের ওপর বিপজ্জনক প্রভাব রয়েছে। এগুলোর কারণে মানুষ ভুল-ভ্রান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে।

মানুষের জন্য নিষ্পাপ পথনির্দেশকের প্রয়োজনীয়তা

যেহেতু মানুষের ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা রয়েছে সেহেতু তার একজন নিষ্পাপ পথনির্দেশকের প্রয়োজন। আর এজন্যই মানুষকে পথনির্দেশনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ নবী-রাসূল ও ইমামগণ পাঠিয়েছেন। ইমাম মূসা ইবনে জাফর (আ.) তাঁর শিষ্য

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হিশামকে বলেন : 'মহান আল্লাহ্ মানুষকে দু'টি পথনির্দেশক দিয়েছেন : প্রকাশ্য পথনির্দেশক ও গুপ্ত পথনির্দেশক। প্রকাশ্য পথনির্দেশক হলেন নবী-রাসূল ও ইমামগণ, আর গুপ্ত পথনির্দেশকের অন্তর্ভুক্ত হল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বা বিবেক।'[১০]

নবী-রাসূল ও ইমামগণ আসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা সরাসরি মহান আল্লাহ্–যিনি সকল বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত তাঁর নিকট থেকে ধর্মীয় বিষয়াদি গ্রহণ করতেন। সুতরাং যে শিক্ষা এমন উৎসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তার ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যায়।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

আমরা দেখি পশুপাখি প্রকৃতিগতভাবেই ভাল ও মন্দ বুঝতে পারে, তাদের খাবারের উৎস সম্পর্কে জানে এবং জানে কীভাবে তার জীবন যাপন করতে হবে। কিন্তু এর বিপরীতে মানুষ কিসে তার ভোগান্তি হবে, আর কার মাধ্যমে এর প্রতিকার সম্ভব তা জানে না, কে তার শত্রু, কে তার মিত্র, তা জানে না। সে তার আত্মরক্ষার জন্যও কোন উপকরণ ধারণ করে না। সে এর সবকিছুই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَ اللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না এবং তিনি তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন যেন তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।'[১১]

মানুষের দক্ষতা ও ক্ষমতার বিভিন্নমুখি বিকাশের জন্য, যেমন কথা বলা, উন্নত মানসিকতা অর্জন, হাঁটা-চলা করা, সৎভাবে জীবন-যাপন, ন্যায়পরায়ণতাকে ভালবাসা ইত্যাদির জন্য একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। শিক্ষা তার জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং সৃষ্টিকে উন্নত করে, যেখানে প্রশিক্ষণ ব্যবহৃত হয় তার সহজাত ক্ষমতা ও আধ্যাত্মিক প্রবণতাকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে। একজন শিক্ষক তাকে যে জিনিসটি সে জানে না তা শিক্ষা দেন, যেখানে একজন প্রশিক্ষক তার সহজাত ক্ষমতাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত সময়

আমরা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি যে, শিশুরা বয়স্কদের তুলনায় শিক্ষাগ্রহণ করার ক্ষেত্রে বেশি উপযুক্ত। শিশু বয়সে তাদেরকে যা শিক্ষা দেয়া হয় তা তারা আত্মস্থ করে নেয়। এটা বলা হয় যে, বাল্য অবস্থায় শিক্ষা অর্জন হল পাথরে খোদাই করার মত, কিন্তু বয়স্কাবস্থায় শিক্ষা অর্জন পানির ওপরে রেখা টানার মতো।

আবার এটাও বলা হয় : একজন শিশু নরম কাদার মতো, তাকে যেভাবে গঠন করা হবে সে সেই আকৃতি গ্রহণ করবে। কিন্তু যার বসয় বেশি হয়ে গেছে তার ব্যক্তিত্ব ও পরিচয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নীতি দ্বারা গঠিত হয়ে গেছে এবং সে অনেক বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে; তাকে পরিবর্তন করা কঠিন।

ইমাম আলী (আ.) শিক্ষাগ্রহণের জন্য শিশু বয়সকেই উপযুক্ত বলেছেন। এ সময়েই শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি উপদেশ দিয়েছেন।

পিতার কর্তব্য

মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনকারী অন্যতম কারণ হল তার পারিবারিক পরিবেশ এবং পিতামাতার নির্দেশনা বা তত্ত্বাবধান। পিতামাতার তত্ত্বাবধান শিশুর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে তার আচার-আচরণ ও ব্যবহার গঠনের ক্ষেত্রে। শিশু অবস্থায় মানসিকতা থাকে কোমল-নমনীয়, তাই যে বিশ্বাসের সাথে তারা পরিচিত হয় তা স্থায়িত্ব লাভ করে।

যেহেতু ভাল ব্যবহার একজন ব্যক্তির শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক সেজন্য ইসলাম এর ওপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) এ ব্যাপারে বলেন : 'শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে তোমার ওপর তোমার সন্তানের অধিকার আছে। কারণ, সে তোমার অংশ এবং তার জীবনের ভাল-মন্দ তোমার ওপর নির্ভর করে। তোমার জানা উচিত তার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য তুমি দায়ী। তুমি তাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দিকে পরিচালিত করতে এবং তাকে তার দায়িত্ব পালনে সাহায্য কর। তোমার সতর্ক হওয়া উচিত যে, তোমার সন্তানের শিক্ষার জন্য তোমাকে দায়ী করা হবে। যদি সে কোন খারাপ কাজ করে তাহলে তার জন্য তোমাকেও শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এজন্যই ইমামগণ শিশুদের অধিকার সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। শিশুদের অন্যান্য অধিকারগুলো হল : তাদের জন্য ভাল নাম নির্বাচন, কুরআন শিক্ষা দেওয়া, সাঁতার ও তীর চালনা (লক্ষ্যভেদ বা শুটিং) শিক্ষা দেয়া, তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা, বিয়ে দেওয়া, ঠিকমত ভরণ-পোষণ দেওয়া, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

সর্বোৎকৃষ্ট উপদেশদাতা

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি পরিবেশের প্রতিটি উপাদান থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। ইমাম আলী (আ.) বলেন : 'প্রত্যেক শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য প্রতিটি জিনিসের মধ্যে উপদেশ নিহিত রয়েছে।'[১২]

বিশিষ্ট সুফি আবুল খায়ের বলেন : 'আমি একটি সরু গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম যেখানে মেথররা মলের কূয়া পরিষ্কার করছিল। আমার সাথীরা দুর্গন্ধ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নাক বন্ধ করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করছিল। মেথর তাদেরকে সম্বোধন করে বলল : এই মল তোমাদেরকে কিছু বলছে। এটা বলছে : আমরা ঐ সব সুস্বাদু খাবার যা লাভের জন্য তোমরা খুব চেষ্টা করতে। আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম এবং এ আবর্জনায় পরিণত হয়েছি। তোমরা কেন আমাদের থেকে পালিয়ে যাচ্ছ? আমরা তোমাদেরই অভ্যন্তরের রং এবং গন্ধ। এ কথা শুনে জনতা চিৎকার করে উঠল এবং কাঁদতে লাগল।'[১৩]

তাই বলা যায়, একেবারে নোংরা একটা জিনিস মলের মধ্যেও মানুষের জন্য শিক্ষার বিষয় রয়েছে।

আবার কিছু সংখ্যক উপদেশদাতা এবং তাদের উপদেশ মানুষের ওপর অসম্ভব রকমের প্রভাব বিস্তার করে। যেগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল :

১. পবিত্র কুরআন

আল্লাহ্ ব্যতীত আমাদের জন্য আর কেউ উত্তম উপদেশ দিতে পারে না, যিনি আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি দিক সম্পর্কে জ্ঞাত। আল্লাহ্ বলেন :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট!'[১৪]

পবিত্র কুরআন বা আল্লাহ্র বাণী মানুষকে নানাভাবে সতর্ক করেছে। এজন্যই মহানবী (সা.) পবিত্র কুরআনকে সবচেয়ে সহজবোধ্য বাণী, সর্বোৎকৃষ্ট উপদেশ এবং সবচেয়ে উত্তম ঘটনা বর্ণনাকারী গ্রন্থ বলে অভিহিত করেছেন।[১৫]

২. মৃত্যু এবং অতীত মানুষের জীবন বিশ্লেষণ

মৃত্যু এবং অতীত কালের মানুষের জীবনে যা ঘটেছে তা উত্তম উপদেশদাতা। মহানবী (সা.) বলেন :

كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا

'মৃত্যুই আমাদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্য যথেষ্ট।'

ইমাম আলী (আ.) এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন : 'আমি তোমাকে সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করতে এবং এর প্রতি অমনোযোগিতা কমিয়ে ফেলতে উপদেশ দিচ্ছি। তুমি কিভাবে মৃত্যুকে উপেক্ষা করবে যখন এটি তোমার পেছনে রয়েছে? তুমি কিভাবে মৃত্যুর ফেরেশতা থেকে পালাবে যখন সে তোমাকে আরেকটি সুযোগ দেবে না? যে মৃত ব্যক্তিগুলোকে তুমি প্রত্যক্ষ করেছ তারাই তোমার উপদেশ গ্রহণের জন্য যথেষ্ট। তোমরা তাদের কবরে নিয়ে গিয়েছ। তারা নিজেরা যেতে পারেনি; তোমরা তাদেরকে কবরে শুইয়ে দিয়েছ, তারা নিজেদের থেকে তা করতে পারেনি। মনে হয় তারা যেন কখনও এ পৃথিবীতে বসবাস করেনি এবং পরকালই তাদের আবাসস্থল ছিল। তারা যে স্থানকে সরগরম করে বসবাস করত তা নির্জন করে চলে গেছে, আর যে স্থানকে নির্জন মনে করত সেখানে গিয়ে বসবাস করছে। যা পরিত্যাগ করতে হবে তারা তা নিয়ে ব্যস্ত ছিল এবং যে স্থানে যেতে হবে সে স্থানকে বেমালুম ভুলেই ছিল। এখন তারা তাদের পাপ স্খলন করতে পারছে না এবং তাদের পুণ্য এতটুকুও বাড়াতে পারছে না। তারা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এর প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল এবং দুনিয়া তাদেরকে নিদারুণভাবে বঞ্চনা করেছে। তারা দুনিয়াকে বিশ্বাস করেছিল, এখন দুনিয়া তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় হোন। যে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ঘরে চিরস্থায়ীভাবে থাকার আদেশ করা হয়েছে সেদিকে দ্রুত এগিয়ে থাকার প্রস্তুতি গ্রহণ কর। কারণ, সেদিকে প্রতিনিয়ত তোমাদেরকে আহ্বান ও আমন্ত্রণ জানান হচ্ছে। ধৈর্য সহকারে আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার কর এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থেকে তোমাদের প্রতি তাঁর পূর্ণ আনকূল্য যাচাই কর। কারণ, আগামীকাল তোমাদের জন্য আজই রুদ্ধ হতে পারে। লক্ষ্য কর দিনের ঘণ্টাগুলো, মাসের দিনগুলো, বছরের মাসগুলো এবং জীবনের বছরগুলো কত দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে!'[১৬]

অন্য এক খুতবায় আলী (আ.) বলেছেন : 'ইতিহাসে অসংখ্য উপদেশ রয়েছে; আমালিকরা কোথায়, কোথায় তাদের বংশধররা? ফিরআউনরা ও তাদের সন্তানরা কোথায়? কোথায় 'রাস' নগরীর অধিবাসীরা যারা নবীদের হত্যা করত, তাদের হাদীসের আলো নিভিয়ে দিত এবং অত্যাচারী ও আগ্রাসীদের পথ প্রশস্ত করত? কোথায় সেসব নেতা যারা হাজারো সেনাকে পরিচালিত করত এবং নগর পত্তন করেছিল?

হে বিশ্বাসীরা! আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত হওয়ার উপদেশ দিচ্ছি, যে আল্লাহ্ তোমাদের সুন্দর পোশাক পরিয়েছেন এবং যিনি তোমাদের অফুরন্ত নেয়ামত দান করেছেন। যদি চিরস্থায়ী জীবনের অথবা মৃত্যু থেকে পালানোর কোন পথ থাকে তবে দাউদের পুত্র সোলায়মান নিশ্চয়ই তা পছন্দ করতেন। কারণ, আল্লাহ্ তাঁকে নবুওয়াতের সাথে সাথে জীন ও মানব জাতিকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর দিন শেষ হয়ে গেল এবং মৃত্যুর তীর তাঁর দিকে নিক্ষেপ করা হল, তিনি তাঁর ঘরবাড়ি এবং আশ্রয় ফেলে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য মানুষ যেগুলো লাভ করেছিল।'

৩. সময়

সময়ের পরিক্রমায় কোন জাতি উন্নতি করে আবার কোন জাতি শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়। সময়ও মানুষের সতর্ক হওয়ার অন্যতম উৎস হতে পারে। ইমাম মূসা ইবনে জাফর (আ.) তাঁর ছাত্র হুসামকে উপদেশ দেন : 'পৃথিবী ও এর অধিবাসীদের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ কর। এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনে সময় বা যুগের কসম খাওয়ার একটি কারণ হতে পারে।'

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইমাম আলী (আ.) সময়কে শ্রেষ্ঠ উপদেশদাতা এবং শিক্ষক হিসাবে গণ্য করে বলেছেন : 'পৃথিবী তোমাকে শ্রেষ্ঠ উপদেশ দান করে এ শর্তে যে, তুমি তার বিচ্ছেদ ঘটানোর মাধ্যমে শিক্ষা নেবে।'[১৭]

তবে সমস্যা এখানে যে, 'শিক্ষাগ্রহণের বিষয় অসংখ্য, কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক মানুষই শিক্ষাগ্রহণ করে।'[১৮]

বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থের ৭৮তম খণ্ডের ৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইমাম আলী (আ.) মাদায়েন অতিক্রম করছিলেন তখন তিনি সম্রাট নওশেরওয়ানের প্রাসাদ লক্ষ্য করেন যেটা ধবংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন : 'কেন তোমরা সূরা দুখানের ২৫ থেকে ২৯ নং আয়াত তেলাওয়াত কর না যেখানে বলা হয়েছে :

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنَّاتٍ وَّ عُيُوْنٍ وَّ زُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ وَّ نَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فَاكِهِيْنَ كَذَالِكَ وَ أَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِيْنَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ وَ مَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ

তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবন! কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য স্থান! কত সুন্দর উপকরণ যাতে তারা খোশগল্প করত! এমনই হয়েছিল এবং আমি এগুলোর মালিক করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। তাদের জন্য ক্রন্দন করেনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তারা অবকাশও পায়নি।'

৪. অভিজ্ঞতাসমূহ

আমরা জানি, অন্যদের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করা জ্ঞান অর্জনের অন্যতম নিরাপদ পথ। ইমাম আলী (আ.) এ ব্যাপারে বলেন : 'যে বিষয়গুলো পণ্ডিতরা কষ্ট করে সংগ্রহ করেছেন এবং তোমার জন্য মুক্ত করেছেন পরবর্তী কিছু করার জন্য সেগুলো মনোযোগ সহকারে ও ভালভাবে অধ্যয়ন কর।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : 'একজন বিশ্বাসী এক গর্তে দু'বার পতিত হয় না।'

সঠিক পথ গ্রহণ এবং অযথার্থ পদ্ধতি এড়ানোর জন্য অভিজ্ঞতা মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এ প্রসঙ্গে আলী (আ.)-এর কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল : 'নৈতিক নিয়ম-কানুন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা হল শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।' 'জ্ঞানীদের জন্য অভিজ্ঞতাসমূহ হল উপদেশের শ্রেষ্ঠ উৎস।' 'প্রতিটি অভিজ্ঞতার মধ্যে উপদেশ লুকিয়ে আছে।' 'জ্ঞানী ব্যক্তি হল সে যে তার অভিজ্ঞতাসমূহ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।'

কতিপয় শ্রেষ্ঠ উপদেশ

পবিত্র কুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও ইমামগণের হাদীসে অসংখ্য শ্রেষ্ঠ উপদেশ বাণী বর্ণিত হয়েছে। এখানে ঐ সব শ্রেষ্ঠ উপদেশ বাণী থেকে মাত্র কয়েকটি উপস্থাপন করা হল :

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنَى وَ فُرَادَى...

'বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি : তোমরা আল্লাহ্র নামে এক একজন করে, দু'দুজন করে দাঁড়াও...।'[১৯]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে উপদেশ দিচ্ছেন একটি মাত্র বিষয়ে। আর তা হল কেবল আল্লাহ্র জন্যই দাঁড়ানোর অর্থাৎ কিয়াম করার এবং অন্য কোন কিছুর জন্য নয়। আর এ ধরনের আন্দোলনই ফলদায়ক।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপদেশ

কাইস ইবনে আসিম বলেন : 'বনু তামীম গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক ও আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম : হে রাসূলুল্লাহ্! যেহেতু আমরা সবসময় আপনার সাথে থাকি না এবং আমরা মরুভূমিতে বসবাস করি, অনুগ্রহ করে আমাদের কিছু উপদেশ দিন যাতে আমরা সঠিক পথে চলতে পারি। মহানবী (সা.) বললেন : হে কাইস! প্রতিটি সৌভাগ্যের সাথে দুর্ভাগ্যও রয়েছে; জীবনের সাথে মৃত্যু এবং এ পৃথিবীর সাথে পরকাল। আমাদের প্রত্যেককে আমরা যা করি তার হিসাব দিতে হবে ভাল বা মন্দের। তুমি অবশ্যই একজনের সঙ্গ লাভ করবে যাকে তোমার সাথে কবরে রাখা হবে। তুমি মৃত, কিন্তু সে জীবিত। সে যদি সহৃদয় হয় তাহলে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তোমাকে আদর করবে, যদি সে হতভাগ্য হয় সে তোমার বিদ্রোহী হবে। তারপর তোমরা কিয়ামতের দিন একত্রে উপস্থিত হবে। তোমাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তাই সঠিক ব্যক্তিকে বেছে নাও। যদি সে সৎকর্মপরায়ণ হয় তুমি তাকে সঙ্গ দেবে এবং যদি সে অসৎকর্মপরায়ণ হয় তুমি তাকে ভয় করবে। আর সে হল তোমারই কর্ম।'[২০]

হযরত ফাতিমা (আ.)-এর উপদেশ

হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (আ.) আনসার ও মুহাজিরদের সামনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে তিনি ধর্মের আইন-কানুন, আল্লাহ্‌র উপাসনা এবং রাসূলের আনুগত্য সম্পর্কে গুরুত্ব প্রদান করে বলেন : 'আল্লাহ্ ঈমানকে শির্‌ক হতে তোমাদের পরিশুদ্ধ থাকার জন্য নির্ধারণ করেছেন। ঔদ্ধত্য ও অহংকার হতে বিরত থাকার জন্য নামাযকে ওয়াজিব করেছেন। আত্মার পরিশুদ্ধি ও সম্পদের বরকতের জন্য যাকাত নির্ধারণ করেছেন। একনিষ্ঠতা সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে রোযাকে ওয়াজিব করেছেন। ইসলামী বিধানকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে হজ্বকে ওয়াজিব করেছেন। হৃদয়সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ন্যায়পরায়ণতাকে নির্ধারণ করেছেন। মুসলিম উম্মাহর মাঝে সংহতি সৃষ্টির লক্ষ্যে আমাদের (আহলে বাইতের) অনুসরণকে আবশ্যক করেছেন। অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা হতে মুক্তির লক্ষ্যে ইমামত ও আমাদের নেতৃত্বকে নির্ধারণ করেছেন। জিহাদকে ইসলামে মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়াজিব করেছেন। ধৈর্য ও সংযমকে আল্লাহ্‌র পুরস্কারের মাধ্যম হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। সাধারণ মানুষের সংশোধনের জন্য সৎ কাজের প্রতি আদেশকে আবশ্যক করেছেন। পিতামাতার প্রতি সদাচরণকে আল্লাহ্‌র ক্রোধ থেকে মুক্তির মাধ্যম হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। সংখ্যা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে আত্মীয়দের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিধানকে আবশ্যক করেছেন। প্রাণরক্ষার জন্য কেসাসকে ওয়াজিব করেছেন। গুনাহ থেকে মুক্তির মাধ্যম হিসাবে মানত বা নযর পালনকে নির্ধারণ করেছেন। ঘাটতি মোকাবিলার লক্ষ্যে ওজনে কম দেয়াকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কলুষতা ও পঙ্কিলতা থেকে বিরত থাকার জন্য মদপানকে হারাম করেছেন। আযাব থেকে রক্ষার মাধ্যম হিসাবে অপবাদ ও গালি-গালাজকে হারাম করেছেন। আত্মসম্মান রক্ষার লক্ষ্যে চুরি করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ শির্‌ককে হারাম ঘোষণা করেছেন, যাতে বান্দারা ইখলাসের সাথে তাঁর বন্দেগী করতে পারে। অতএব, তিনি যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী সে অনুযায়ী তাকওয়া অবলম্বন কর। কখনও তাঁর আদেশের অমান্য করবে না এবং চেষ্টা করবে যাতে মুসলমান অবস্থাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পার।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ পূর্ণাঙ্গরূপে মেনে চল এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পথ অনুসরণ কর। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন : إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে[২১]।'[২২]

ইমাম আলী (আ.)-এর উপদেশ

ইমাম আলী (আ.) বলেন : 'আমি তোমাকে পাঁচটি উপদেশ দেব। এগুলো অর্জনের জন্য তুমি যত চেষ্টা করবে তত তোমার জন্য উত্তম হবে :

১. আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও ওপর নির্ভর করবে না;

২. কেবল তোমার পাপকেই ভয় কর;

৩. তোমাকে যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় যদি তুমি তা না জান তাহলে কখনও 'আমি জানি না' বলতে লজ্জাবোধ কর না;

৪. তুমি যা জান না, তা জানতে কখনও লজ্জিত হয়ো না এবং

৫. ধৈর্যধারণ করার অভ্যাস কর। কারণ, দেহের জন্য মাথা যেরূপ ঈমানের জন্য ধৈর্যও সেরূপ।'[২৩]

ইমাম হাসান (আ.)-এর উপদেশ

ইমাম হাসান (আ.)-এর উপদেশাবলির মধ্যে একটি হল : 'হে আদমসন্তানরা! আল্লাহ্ যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন সে কাজ পরিত্যাগ কর তাহলে তাঁর অনুগত বান্দা হিসাবে বিবেচিত হবে। বিত্তবান হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক। একজন সত্যিকার মুসলমান হওয়ার জন্য তোমার প্রতিবেশীর সাথে দয়ার্দ্র ব্যবহার কর, তুমি অন্যদের থেকে যে আচরণ পছন্দ কর মানুষের সাথে সে-ই আচরণ কর। তোমাদের পূর্ববর্তী ধনী ব্যক্তিরা বিপুল সম্পদ পুঞ্জিভূত করত, দুর্ভেদ্য বাড়ি তৈরি করত এবং অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত– তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তাদের ঘর-বাড়ি কবরে পরিণত হয়েছে। হে আদমসন্তানরা! জন্মের সময় থেকে তোমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার চেষ্টা করে যাচ্ছ। তাই ভবিষ্যতের জন্য সবর কর। কারণ, একজন সত্যিকার বিশ্বাসী সঞ্চয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর একজন অবিশ্বাসী স্বল্পকালীন কামনা-বাসনা চরিতার্থ করে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সূরা বাকারার ১৯৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

وَ تَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

'আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভয়।'

ইমাম হুসাইন (আ.)-এর উপদেশ

এক ব্যক্তি ইমাম হুসাইন (আ.)-এর কাছে এসে বলল : 'আমি একজন অপরাধী। আমি পাপ থেকে বিরত থাকতে পারি না। আমাকে আপনি উপদেশ দিন।' ইমাম হুসাইন বললেন : 'পাঁচটি কাজ কর, এরপর তোমার যত খুশী পাপ করতে থাক :

১. আল্লাহ্‌র দেওয়া খাদ্য খেও না। এরপর যত ইচ্ছা খারাপ কাজ কর।
২. আল্লাহ্‌র অধীন এলাকা থেকে বাইরে চলে যাও; এরপর তুমি যে কোন খারাপ কাজে লিপ্ত হও।
৩. তোমার পাপ কাজ করার জন্য এমন কোন জায়গা নির্ধারণ কর যেখানে আল্লাহ্‌ উপস্থিত নন; তারপর তোমার যা ইচ্ছা কর।
৪. যখন মৃত্যুর ফেরেশতা তোমার কাছে আসবে তখন তাকে বল যেন সে তোমাকে ত্যাগ করে; তারপর যা খুশী কর।
৫. যখন মালিক (জাহান্নামের ফেরেশতা) তোমাকে আগুনে নিক্ষেপ করতে চাইবে তখন আগুনে প্রবেশ কর না; তারপর তুমি যা খুশী কর।'[২৪]

ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর উপদেশ

এক ব্যক্তি ইমাম আলী ইবনুল হুসাইন যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর কাছে এসে তার সমস্যাদির বিষয়ে অভিযোগ করল। ইমাম বললেন : 'আদমসন্তানরা হতভাগা। কারণ, প্রতিদিন তারা তিনটি বিপজ্জনক শত্রুর মুখোমুখি হয়, কিন্তু তারা এ থেকে শিক্ষা লাভ করে না। যদি তারা এগুলো থেকে শিক্ষা নেয় তাহলে তাদের অসংযত বিষয়কে দমন করা সহজ হবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

প্রথমত প্রতিদিন তার আয়ু কমে আসছে। যদি তার সম্পদ কমে যায় সে হতাশাগ্রস্ত হয়। কিন্তু তার জানা উচিত পার্থিব সম্পদের বিকল্প আছে, কিন্তু জীবনের কোন বিকল্প নেই।

দ্বিতীয়ত প্রতিদিন সে তার রুজি উপভোগ সম্পন্ন করে। যদি তা বৈধভাবে হয়ে থাকে তাহলে সে পুরস্কৃত হবে, আর যদি তা অবৈধভাবে হয়ে থাকে তাহলে সে শাস্তি পাবে।

তৃতীয়ত আর এটি অন্য দু'টির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যখন সে একটি দিন অতিবাহিত করে তখন সে আসলে পরকালের দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু জানে না যে, সে কি জান্নাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে নাকি জাহান্নামের দিকে।[২৫]

ইমাম বাকের (আ.)-এর উপদেশ

জাবির ইবনে ইয়াযীদ জু'ফী বলেন : 'আমি ইমাম বাকের (আ.)-এর সান্নিধ্যে আঠারো বছর অতিবাহিত করেছি। তাঁর নিকট থেকে বিদায় গ্রহণের সময় আমি তাঁর কাছ থেকে কিছু উপদেশ চাইলাম। ইমাম বললেন : 'হে জাবির! এ আঠারো বছর পর! তুমি (আজ) জ্ঞানের এক অতল সাগরে পরিণত হয়েছ যা অন্য কারও পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়।'

তারপর ইমাম বললেন : 'আমার অনুসারীদের আমার শুভেচ্ছা জানিও এবং তাদের বল : আমাদের সাথে মহান আল্লাহ্‌র কোন দূরত্ব নেই। কেউ তাঁর ইবাদত ছাড়া তাঁর সান্নিধ্য অর্জন করতে পারে না।

হে জাবির! যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে এবং আমাদের ভালবাসে, সে আমাদের বন্ধু বলে বিবেচিত হবে, কিন্তু যে পাপ কাজ করে আমাদের বন্ধুত্ব তার কোন কাজে আসবে না।

হে জাবির! এমন কেউ কি আছে যে আল্লাহ্‌র কাছে কিছুর প্রার্থনা করে, কিন্তু তা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত হয়? কেউ কি আছে যে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে, কিন্তু কোন নিরাপত্তা পায় না? এমন কেউ কি আছে, যে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়?

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হে জাবির! এ পৃথিবীকে একটি আশ্রয়স্থল মনে কর যেখানে তুমি মাত্র কয়েকদিন অবস্থান করবে এবং এরপর তুমি তা ত্যাগ করবে। এ পৃথিবী কি একটি ঘোড়া সদৃশ নয় যাতে তুমি স্বপ্নের মধ্যে সওয়ার হও, কিন্তু যখন তুমি জেগে ওঠ তখন ঘোড়ার কোন চিহ্নই থাকে না। এ পৃথিবী তো একটি ব্যবহৃত বস্ত্রের সাথেই তুলনীয়।

হে জাবির! জ্ঞানী মানুষের জন্য এ পৃথিবী একটি ছায়ার মত। যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, তার জন্য এটি উদারতার উৎস। প্রার্থনা উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করার একটি মাধ্যম, দান-সদাকাহ রুজি বৃদ্ধি করে, রোযা এবং হজ্ব মানুষের হৃদয়কে শান্ত করে, ধর্মীয় শাস্তি মানুষকে রক্তপাতের হাত থেকে রক্ষা করে এবং আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা ধর্মকে শক্তিশালী করে। আল্লাহ্ আমাদের তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা নিভৃতে আল্লাহ্কে ভয় করে এবং কিয়ামত দিবসের ভয়ে ভীত।'[২৬]

ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর উপদেশ

সুফিয়ান সাওরী বলেন : 'আমি ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং বললাম : আমাকে কিছু উপদেশ দিন যেন আমি তা পালন করতে পারি। ইমাম জিজ্ঞাসা করলেন : হে সুফিয়ান! তুমি কি তা স্মরণ রাখবে? আমি জবাব দিলাম : জী, হে রাসূলের কন্যার সন্তান! আমি তা স্মরণ রাখব। তারপর তিনি বললেন : হে সুফিয়ান! একজন মিথ্যাবাদীর পৌরুষত্বের (মর্যাদার) অভাব রয়েছে, একজন মিথ্যাবাদী শান্তিতে থাকতে পারে না। রাজার কোন ভাই নেই, উদ্ধত ব্যক্তির কোন বন্ধু নেই এবং বদমেজাজী লোকের জন্য কোন মহানুভব ব্যক্তি নেই।' তারপর ইমাম চুপ করলেন। আমি তাঁকে বললাম : হে রাসূলের কন্যার সন্তান! অনুগ্রহ করে আরও বলুন। তিনি বললেন : 'হে সুফিয়ান! জ্ঞানী হওয়ার জন্য আল্লাহ্র ওপর নির্ভর কর, ঐশ্বর্যশালী বোধ করার জন্য আল্লাহ্ তোমাকে যা দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট হও। তোমার বিশ্বাসকে বাড়াবার জন্য মানুষ তোমার সাথে যেমন আচরণ করে তেমন আচরণ কর, পাপাচারীর সঙ্গী হয়ো না; কারণ, তারা তোমাকে পাপ কাজ শিক্ষা দেবে; এবং তোমার বিষয়াদির ব্যাপারে খোদাভীরু লোকের সাথে পরামর্শ কর।'

সুফিয়ান আরও জানতে চাইলে ইমাম বলেন : 'হে সুফিয়ান! যে ব্যক্তি ক্ষমতা ও প্রাচুর্য ছাড়া সম্মানের আকাঙ্ক্ষা করে তার উচিত পাপ কাজে লিপ্ত না হয়ে আল্লাহ্র আনুগত্যকে পছন্দ করা।'

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তিনি আরও বলেন : 'হে সুফিয়ান! আমার পিতা আমাকে তিনটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন ও তিনটি বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন : 'হে আমার সন্তান! যে পাপীকে সঙ্গ দেয় সে অপরিবর্তিত থাকতে পারে না; যে তার কথায় সতর্ক হয় না সে অনুতপ্ত হবে এবং যে পুনপুন নিকৃষ্ট জায়গায় যায় সে অভিযুক্ত হবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : 'হে রাসূলুল্লাহ্‌র সন্তান! সেই তিনটি জিনিস কী, যেগুলো সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক করা হয়েছে?'

তিনি বললেন : 'আমার পিতা আমাকে ঐ ব্যক্তির সঙ্গ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছেন যে অন্যের প্রাচুর্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয়, যে অন্যের দুর্ভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যে রটনাকারী।'[২৭]

ইমাম মূসা কাযেম (আ.)-এর উপদেশ

ইমাম মূসা কাযেম (আ.) বলেছেন : 'তোমার দিন ও রাতকে চারটি ভাগে ভাগ করতে চেষ্টা কর : এক-চতুর্থাংশ আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য; এক-চতুর্থাংশ জীবিকা অর্জনের জন্য; এক-চতুর্থাংশ তোমার ভাইদের সঙ্গ দেওয়ার জন্য এবং এক-চতুর্থাংশ ব্যক্তিগত বৈধ উপভোগের জন্য।

তোমার হৃদয়ে দারিদ্র্যের চিন্তা ও দীর্ঘায়ু লাভ করার চিন্তা প্রোথিত কর না; কারণ, যে দারিদ্র্যের চিন্তা করে সে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ে এবং যে দীর্ঘায়ু লাভ করার চিন্তা করে সে লোভী হয়ে পড়ে। এ পৃথিবীতে তোমার সময়ের সদ্ব্যবহার কর। যে সব বৈধ আকাঙ্ক্ষা তোমার মর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না অথবা অমিতচার নয় সেসব উপভোগ কর। এর মাধ্যমে তুমি ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হবে। এটা এজন্য যে, একটি হাদীসে বলা হয়েছে : যে তার ধর্মের জন্য দুনিয়া ছেড়ে দেয় অথবা দুনিয়ার জন্য ধর্ম ছেড়ে দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'[২৮]

ইমাম রেযা (আ.)-এর উপদেশ

ইমাম রেযা (আ.) বলেন : সাতটি বিষয়ের সাথে অপর সাতটি বিষয় না থাকলে মানুষ পরিহাসের পাত্র হয় :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১. যে শুধু মৌখিকভাবে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে, অথচ অন্তরের গভীর থেকে অনুতপ্ত হয় না, সে নিজেকেই পরিহাস করে।

২. যে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চায়, কিন্তু নিজে কোন প্রচেষ্টা চালায় না, সে নিজের সাথে উপহাস করে।

৩. যে আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাত প্রার্থনা করে, কিন্তু যথেষ্ট ধৈর্যশীল নয়, সেও নিজেকে পরিহাস করে।

৪. যে আল্লাহ্‌র কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপত্তা চায়, কিন্তু পাপ কাজ ও অন্যায় কামনা-বাসনা ত্যাগ করে না, সেও নিজেকে পরিহাস করে।

৫. যে মৃত্যু সম্পর্কে কথা বলে, কিন্তু এর জন্য তৈরি হয়নি, সে নিজেকে পরিহাস করে।

৬. যে মৃত্যুকে স্মরণ করে, কিন্তু এর মুখোমুখি হতে ইচ্ছুক নয় সেও নিজেকে পরিহাস করে।

৭. যে সতর্ক হওয়ার জন্য ইচ্ছা করে, কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সতর্কতা অবলম্বন করে না, সেও নিজেকে পরিহাস করে।[২৯]

ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর উপদেশ

এক ব্যক্তি ইমাম জাওয়াদ (আ.)-কে কিছু উপদেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। ইমাম বললেন : 'ধৈর্যের নিকটবর্তী থেক, দারিদ্রকে গ্রহণ কর। তুমি সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র নজরে রয়েছ, সুতরাং তুমি কী কর সে বিষয়ে সতর্ক হও।'[৩০]

ইমাম নাকী (আ.)-এর উপদেশ

ইমাম নাকী (আ.) বলেন : 'যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, অন্যরা তাকে ভয় করে এবং যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে তাকে অন্যরা আনুগত্য করে। যে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে সে অন্যের ক্রোধের ভয় করে না। যে আল্লাহ্‌কে ক্রোধান্বিত করে সে নিশ্চিতভাবেই অন্যদের ক্রোধের সম্মুখীন হয়।'[৩১]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইমাম হাসান আল আসকারী (আ.)-এর উপদেশ

ইমাম হাসান আল আসকারী (আ.) তাঁর অনুসারীদের বলেন : 'আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন হও, মিতচারী হও, আল্লাহ্‌র কারণে কষ্ট কর, মানুষের আমানতের ক্ষেত্রে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হও, তোমাদের সিজদাকে দীর্ঘায়িত কর, তোমাদের প্রতিবেশীদের প্রতি ভাল আচরণ কর যা মুহাম্মাদ (সা.) সবসময় করতেন। তোমাদের প্রতিবেশীদের সাথে নামায পড়, তাদের জানাযায় শরীক হও, তাদের কেউ অসুস্থ হলে দেখতে যাও। তাদের ঋণ পরিশোধ কর। তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ ধর্মপরায়ণ হয় ও সত্য কথা বলে, মানুষের আমানত ফিরিয়ে দেয় এবং মানুষের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে সে আমাকে খুশী করে। এমন ব্যক্তিই আমাদের সত্যিকার অনুসারী এবং আমাদের জন্য মর্যাদার কারণ, অমর্যাদার কারণ নয়।

আমাদের প্রতি যে কোন ধরনের বন্ধুত্বকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা কর। আর যে কোন ধরনের শত্রুতাকে হটিয়ে দিতে চেষ্টা কর। কারণ, আমাদের সম্পর্কে যা কিছু ভাল বলা হয় তা আমাদের জন্য প্রযোজ্য, আর আমাদের সম্পর্কে খারাপ যা কিছু বর্ণনা করা তা আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ্‌র কিতাবে (পবিত্র কুরআনে) আমাদের জন্য একটি দৃঢ় অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। আমরা আল্লাহ্‌র নবীর আত্মীয়। আল্লাহ্‌ আমাদের পবিত্র করেছেন। একমাত্র মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কেউ আমাদের এ মর্যাদা দাবি করতে পারে না। আল্লাহ্‌কে বেশি স্মরণ কর এবং মৃত্যুকে ভুলে যেও না। প্রায়শই আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ কর। নবীর প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত কামনা কর। এমন কাজের দশটি উপকারিতা রয়েছে। আমি তোমাদের যা উপদেশ দিয়েছি তা স্মরণ রাখ। আল্লাহ্‌ তোমাদের রক্ষা করুন। আমার আশীর্বাদ তোমাদের সকলের জন্য।'[৩২]

ইমাম মাহদী (আ.)-এর উপদেশ

ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষারতদের উদ্দেশ্যে বলেন : 'আমার আবির্ভাবের জন্য তোমরা অধিক থেকে অধিকতর প্রার্থনা কর। এ প্রার্থনায় তোমাদের জন্য অত্যধিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।'[৩৩]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তথ্যসূত্র

১. সূরা আহযাব : ২১
২. সূরা শামস : ৯-১০
৩. সূরা কালাম : ৪
৪. বিহারুল আনওয়ার, ৭১তম খণ্ড, পৃ. ৩৮৩
৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২৩
৬. মাআনীল আখবার, পৃ. ২৫৩
৭. সূরা আলে ইমরান : ১৬৪
৮. সূরা আনফাল : ২৪
৯. সূরা হূদ : ৫৬
১০. তুহাফুল উকুল, পৃ. ৩৮৩
১১. সূরা নাহল : ৭৮
১২. গুরারুল হিকাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৭
১৩. আসরারুত তাওহীদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬
১৪. সূরা নিসা : ৫৮
১৫. বিহারুল আনওয়ার, ৭৭তম খণ্ড, পৃ. ১৩৭
১৬. নাহজুল বালাগাহ, খুতবা নং ১৮৮
১৭. মীযানুল হিকমাহ, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫৪২
১৮. নাহজুল বালাগাহ, বাণী ২৯৭
১৯. সূরা সাবা : ৪৬
২০. বিহারুল আনওয়ার,৭৭তম খণ্ড, পৃ. ১১১
২১. সূরা ফাতির : ২৮
২২. তাবারসীর ইহতিজাজ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৪; কাশফুল গুম্মাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৪
২৩. নাহজুল বালাগা, বাণী ৭৯
২৪. বিহারুল আনওয়ার, ৭৮তম খণ্ড, পৃ. ১২৬
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

২৯. কানজুল ফাওয়ায়েদ কারাযাকী, পৃ. ১৫২

৩০. বিহারুল আনওয়ার, ৭৮তম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮

৩১. তুহাফুল উকুল, পৃ. ৫১০

৩২. তুহাফুল উকুল, পৃ. ৪৮৮; বিহারুল আনওয়ার, ৭৮তম খণ্ড, পৃ. ২৭৩।

৩৩. এ অংশটুকু নেওয়া হয়েছে কারওয়ানে ইনতিসারুল মাহ্দী (আ.ফা.) কর্তৃক প্রকাশিত 'হে ইমাম মাহ্দী (আ.)! আপনারই অপেক্ষায়' গ্রন্থ থেকে।

(কোম, ইরান থেকে প্রকাশিত Dr. Farrokhpey কৃত ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থ 'Imam Ali's First Treatise on The Islamic Ethics and Education' থেকে সংকলিত)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হযরত আলী (আ.)-এর জীবনের স্মরণীয় কিছু দিক

আল্লামা সাইয়্যেদ মোর্তজা আসকারী

অনুবাদ : আবুল কাসেম

হযরত আলী (আ.) হলেন ইসলামের অনন্য এক ব্যক্তিত্ব। আমরা এ প্রবন্ধে তাঁর জীবনের স্মরণীয় কিছু দিক তুলে ধরব।

হযরত আলী নবী (সা.) কর্তৃক প্রশিক্ষিত

হযরত আলী (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট লালিত-পালিত ও প্রশিক্ষিত হয়েছেন। তাঁদের পূর্বপুরুষ হাশিম তাঁর সন্তানদের গ্রীষ্মকালে ব্যবসার জন্য ইরান ও সিরিয়ায় এবং শীতকালে ইয়েমেন ও আফ্রিকায় প্রেরণ করতেন। এ রীতি পরবর্তীকালে অব্যাহত থাকে এবং হযরত আবদুল মুত্তালিবের সন্তানরাও ঐ ঋতুতে এরূপ ব্যবসায়িক সফরে বের হতেন। কিন্তু দু'বছর হযরত আবু তালিব ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদিনার বাইরে যেতে পারেননি। এ কারণে তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে এবং তিনি পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। আর মহানবী (সা.) তাঁর অপর চাচা হযরত আব্বাসের নিকট গিয়ে হযরত আবু তালিবের সাহায্যে এগিয়ে আসার প্রস্তাব করেন। তারা উভয়ে আবু তালিবের নিকট গিয়ে প্রস্তাব রাখেন তাঁর সন্তানদেরকে তাঁদের দায়িত্বে অর্পণ করার। তখন আবু তালিব আকিলকে নিজের কাছে রেখে বাকি সন্তানদের দায়িত্ব তাঁদের ওপর অর্পণ করেন। রাসূল (সা.) হযরত আলীকে নিজের জন্য বেছে নেন এবং হযরত আব্বাস জাফরকে সঙ্গে নিয়ে যান।[১]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তখন থেকে রাসূল (সা.) হযরত আলীর লালন-পালন ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং আলী (আ.) বলেন : 'যখন আমি শিশু ছিলাম তখনই তিনি আমার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর পবিত্র বুকে চেপে ধরতেন, তাঁর কাছে টেনে নিতেন এবং তাতে আমি তাঁর পবিত্র শরীরের ঘ্রাণ নিয়েছি। অনেক সময় তিনি কিছু চিবিয়ে আমার মুখে দিতেন। তিনি আমার কথায় কখনও কোন মিথ্যা পাননি এবং আমার কোন কাজে দুর্বলতা পাননি। সে সময় থেকেই আমি তাঁকে অনুসরণ করে চলতাম যেভাবে একটি উষ্ট্রশাবক তার মাকে অনুসরণ করে। তিনি প্রতিদিন সুন্দর নৈতিক চরিত্রের নতুন নতুন দিক আমার নিকট প্রকাশ করতেন এবং আমাকে তা অনুসরণ করার নির্দেশ দিতেন...।'[২] অন্যস্থানে আলী বলেন : 'তিনি আমার কথায় কখনও মিথ্যা পাননি এবং আমার কোন কাজে দুর্বলতা দেখেননি।'[৩]

আলী (আ.) প্রথম ওহী অবতীর্ণের সাক্ষী

মহানবী (সা.) নবুওয়াতের কয়েক বছর পর থেকেই প্রতি বছর এক মাস হেরা পর্বতের গুহায় ইতিকাফে (ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান) বসতেন। তাঁর পূর্বেও তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব সেখানে ইবাদতের জন্য যেতেন। যখন মহানবী (সা.) হেরা পর্বতের গুহায় অবস্থান করতেন হযরত আলী (আ.) সেখানে তাঁর জন্য খাদ্য, পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে যেতেন। তিনি রাসূল (সা.)-এর ওপর প্রথম ওহী অবতীর্ণের ও সাক্ষী ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন : 'যখন আল্লাহ্‌র রাসূলের ওপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল তখন আমি শয়তানের আর্তনাদ শুনেছিলাম। আমি বললাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ আর্তনাদ কিসের? তিনি বললেন : শয়তান পূজিত হওয়ার সকল আশা হারিয়ে ফেলেছে, এটি তারই আর্তনাদ। হে আলী! আমি যা কিছু দেখি তুমিও তা-ই দেখ এবং আমি যা শুনি, তুমিও তা-ই শোন; কিন্তু তুমি নবী নও; বরং তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত ও দায়িত্বশীল।'[৪]

আলী (আ.) রাসূলের সঙ্গে প্রথম নামায আদায়কারী

মহানবী (সা.)-এর ওপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি গৃহে ফিরে আসেন। জীবরাঈল (আ.) ঐ দিনই তাঁর নিকট নামাযের বিধান নিয়ে অবতীর্ণ হন এবং তাঁকে ওজু করা ও নামায পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। তখনই রাসূল (সা.) হযরত খাদীজা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ও হযরত আলীকে নিয়ে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করেন। তাবারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন : 'ইয়াহিয়া ইবনে আরিফ কিন্দী বলেন : আমি হজ্বের জন্য মক্কায় গিয়ে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের অতিথি হলাম। তাঁর গৃহ কাবাঘরের নিকটেই ছিল। মধ্যাহ্নের সময় এক ব্যক্তিকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম।[৫] তার সঙ্গে একজন নারী ও একজন বালক ছিল। অতঃপর বালকটি তার ডান পাশে এবং ঐ নারী তার পেছনে দাঁড়ানো। তারপর তারা উপুড় হল, এরপর সোজা হয়ে দাঁড়াল ও মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমি এ দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হলাম। আব্বাস এলে তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তখন তিনি বললেন : তুমি কি জানতে পেরেছ তারা কে ছিল? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : সে হল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্। সে বলে যে, তার ওপর আসমান থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়। যে তার ডান পাশে ছিল সে হল আলী, আর তার পেছনে যে নারী ছিল সে ছিল তার স্ত্রী খাদিজা। আমি পৃথিবীর ওপর এ তিনজন ব্যতীত অন্য কাউকে এ ধর্মের অনুসারী হিসাবে চিনি না।'[৬]

ইসলামের প্রথম আহ্বান ও হযরত আলীর নেতৃত্বের ঘোষণা

তাবারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন : 'নবুওয়াতের তৃতীয় বর্ষে পবিত্র কুরআনের وَ أَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ (তোমার নিকটাত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন কর)[৭] আয়াতটি অবতীর্ণ হলে মহানবী (সা.) হযরত আলীকে এক পাত্র ঘোল ও একটি দুম্বার রান কিনে তা রান্না করে আবদুল মুত্তালিবের পরিবারের সকলকে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী রাসূলুল্লাহ্‌র নির্দেশ মত সবকিছু প্রস্তুত করে সকলকে ডাকলেন। তাঁরা সকলে এলে রাসূল (সা.) ঐ রান এবং ঘোল থেকে কিছু খেলেন। অতঃপর অতিথিদের সামনে তা পরিবেশনের নির্দেশ দিলেন। তারা সকলে পেট ভরে খেল; কিন্তু তার পরও খাদ্য যে রকম ছিল তেমনই অবশিষ্ট রইল। আবু লাহাব এ দৃশ্য দেখে বলল : 'আশ্চর্য যাদু দেখাল মুহাম্মদ!' সে এ কথা বলার পর সকলেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। তারা চলে গেলে রাসূল (সা.) হযরত আলীকে বললেন : 'দেখলে সে কী করল? তুমি তাদের জন্য আবার আয়োজন কর ও তাদের সবাইকে দাওয়াত দাও।' এবার তারা খাদ্য গ্রহণ শুরু করতেই মহানবী (সা.)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বললেন : 'তোমাদের মধ্যে কে আমাকে আমার ধর্ম প্রচারের কাজে সাহায্য করতে রাজী আছ? আমি তাকে আমার ভাই, সহযোগী ও আমার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে মনোনীত করব।' কিন্তু তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না। একমাত্র হযরত আলী (আ.) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনাকে সাহায্য করব।' মহানবী (সা.) তখন হযরত আলীকে উচুঁ করে উঠিয়ে ধরে বললেন : 'এ হচ্ছে তোমাদের মধ্যে আমার ভাই, সহযোগী, স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি। তোমরা তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে।' তারা উঠে যেতে যেতে আবু তালিবকে উপহাস করে বলল : 'তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র তোমাকে তোমার ছেলের আদেশ মেনে চলার নির্দেশ দিচ্ছে।'[৮]

হযরত আলী মহানবী (সা.)-এর শয্যায়

হযরত আবু তালিবের ইন্তেকালের পর মহানবী (সা.) ও মুসলমানদের ওপর মুশরিকদের নিপীড়ন বৃদ্ধি পেলে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ আসল। কুরাইশরা তাদের পরামর্শের জন্য যে স্থানে সমবেত হত সেখানে সমবেত হয়ে মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। এ হত্যায় যেন কোন বিশেষ গোত্রকে দায়ী না করা যায় এজন্য সকল গোত্র থেকে একজন করে লোক মনোনীত করা হল। বনি হাশিম থেকে আবু লাহাব মনোনীত হল। মহানবী (সা.) জীবরাঈল (আ.) কর্তৃক এ বিষয়ে খবর পেলেন এবং যে রাতে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা হয়েছে সে রাতেই হিজরতের নির্দেশ পেলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) ঐ রাতে আলীকে তাঁর শয্যায় এমনভাবে শায়িত হতে বললেন যেন মুশরিকরা মনে করে স্বয়ং রাসূল সেখানে শুয়ে রয়েছেন। আলী (আ.) তাঁকে প্রশ্ন করলেন : 'এতে কি আপনার জীবন রক্ষা পাবে?' রাসূল (সা.) বললেন : 'হ্যাঁ, এতে আমার জীবন রক্ষা পাবে।' হযরত আলী রাসূল (সা.)-এর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে তাঁর শয্যায় নিশ্চিতভাবে শুয়ে পড়লেন। রাসূল (সা.) অলৌকিকভাবে তাঁর ঘর অবরোধকারী মুশরিকদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সওর পর্বতের দিকে চলে গেলেন। মুশরিকরা আবু লাহাবের পরামর্শে ভোর বেলায় তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাই যখন ভোর হল তারা একযোগে রাসূলের শয়নকক্ষে প্রবেশ করল। কিন্তু তাদের প্রত্যাশার বিপরীতে হযরত আলীকে সেখানে দেখে হতচকিত হয়ে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

গেল। তারা তাঁকে প্রশ্ন করল : 'মুহাম্মাদ কোথায়?' আলী বললেন : 'তোমরা কি তাঁকে আমার হাতে অর্পণ করেছিলে?'

রাসূল (সা.)-এর আমানতের দায়িত্ব পালন

কুরাইশরা একে অপরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখত না; কিন্তু এর বিপরীতে তাদের শত্রু মহানবী (সা.)-এর ওপর তাদের পূর্ণ আস্থা ছিল। এ কারণে তাদের সোনা-রূপা ও অর্থ-সম্পদ তাঁর কাছে আমানতস্বরূপ রাখত, এমনকি তারা তাঁকে 'আমীন' বা বিশ্বস্ত বলে ডাকত। মহানবী (সা.) যখন হিজরত করেন তখন তাঁর নিকট গচ্ছিত আমানতসমূহ হযরত আলী (আ.)-এর হাতে অর্পণ করে তা তাদের প্রকৃত মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। হযরত আলী কাবা ঘরের নিকট দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা দিলেন যে, যারা নবী (সা.)-এর নিকট আমানত রেখেছে তারা যেন তা তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ করে। তিনি তিন দিন ধরে সকলের আমানত ফিরিয়ে দিলেন।

হযরত আলীর প্রতীক্ষায় মহানবী (সা.)

হযরত আলী (আ.)-এর ওপর অপর যে দায়িত্ব মহানবী (সা.) হিজরতের সময় অর্পণ করেছিলেন তা হল তাঁর কন্যা ফাতিমা, ফুফু ফাতিমা বিনতে আবদুল মুত্তালিব এবং হযরত আলীর মাতা ফাতিমা বিনতে আসাদকে সঙ্গে নিয়ে মদিনায় হিজরত করা। মহানবী (সা.) মদিনায় নিকটবর্তী কোবা নামক স্থানে পৌঁছে আলী (আ.)-এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। হযরত আবু বকর তাঁকে মদিনার দিকে রওয়ানা দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকলে তিনি বলেন : 'আলী আসুক, তারপর যাব।' চারশ' আশি কিলোমিটার পথ উত্তপ্ত মরুভূমির ওপর উটের রশি ধরে টেনে টেনে আসতে আলীর পা ফেটে গিয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। রাসূল (সা.) তাঁর মুখের লালা সেখানে লাগিয়ে দিলে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। অতঃপর তাঁদের সঙ্গে নিয়ে তিনি মদিনায় প্রবেশ করেন। এ ঘটনা আলী (আ.)-এর প্রতি মহানবী (সা.)-এর তীব্র ভালবাসার প্রমাণ।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হযরত আলীর বীরত্ব ও সাহসিকতা

বদর যুদ্ধ : বদর যুদ্ধে এক হাজার কুরাইশ যোদ্ধা সশস্ত্র অবস্থায় তিনশ' তেরজন মুসলমান সেনার মুখোমুখি হল। মহানবী (সা.)-এর সঙ্গীরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ, তাঁরা কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলাকে অবরোধ করার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন– যুদ্ধের জন্য নয়। মহানবী (সা.) কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বদর অভিমুখে যাত্রা করলেন। এক অসম যুদ্ধে মুসলমানরা জয়ী হল। এ যুদ্ধে সত্তরজন কুরাইশ নিহত হয়। এর মধ্যে ৩৫ জন বড় যোদ্ধা ও গোত্রপতি আলী (আ.)-এর হাতে নিহত হয়। তৃতীয় হিজরিতে কুরাইশরা বদর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মদিনায় দিকে যাত্রা করে। মহানবীও তাদের মোকাবিলা করার জন্য মদিনা থেকে বের হলে দু'দল উহুদ প্রান্তরে পরস্পরের মুখোমুখি হল। সে সময় যুদ্ধে ঐ ব্যক্তির হাতেই পতাকা অর্পণ করা হত যে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এবং যদি তার হাত থেকে পতাকা পড়ে যেত তবে তারপর যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা তার হাতে তা দেওয়া হত। উহুদের যুদ্ধে কুরাইশদের নয় জন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা যারা একের পর এক পতাকা ধারণ করেছিল তারা আলী (আ.)-এর এর হাতে নিহত হয় যা কুরাইশদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

(চলবে)

তথ্যসূত্র

১. কামিল ফিত তারিখ, ইবনে আসীর প্রণীত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮
২. নাহজুল বালাগাহ, খুতবা কাসেয়াহ, খুতবা নং ২৩৪
৩. প্রাগুক্ত
৪. প্রাগুক্ত
৫. প্রাগুক্ত
৬. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১২, বৈরুত থেকে প্রকাশিত
৭. সূরা শুয়ারা : ২১৪
৮. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১২, বৈরুত থেকে প্রকাশিত

(কোম, ইরান থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন 'মুবাল্লেগান', ১১তম সংখ্য, ১৪২১ হিজরি থেকে অনূদিত)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মুসলিম-দর্শনে অনাদিত্ব বিষয়ক বিতর্ক : একটি পর্যালোচনা

ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী*

মুসলিম-দর্শনে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে অনাদিত্ব বিষয়ক সমস্যাটির ওপর আলোচনা করা হয়েছে। অনাদি (eternal) বলতে বুঝায় নিত্য বা চিরন্তন সত্তাকে যার কোন শুরুও নেই শেষও নেই। সাধারণ ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহ্ই একমাত্র অনাদি বা চিরন্তন, অবিনশ্বর, অব্যয় ও অক্ষয়। তিনি ছাড়া সবকিছুই সৃষ্ট। অতএব, অনাদি বা অনাদিত্ব শুধু আল্লাহ্র ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। হাদিসে কুদ্সিতে রয়েছে (আল্লাহ্ বলেন) : 'আমি ছিলাম গুপ্ত ধনভাণ্ডার, আমি চাইলাম আমার পরিচয় ঘটুক, তাই আমি সবকিছু সৃষ্টি করলাম।' প্রাথমিক যুগের সাধারণ বিশ্বাসীরা এর বাইরে নতুন কোন ধারণা পোষণ করত না। আল্লাহ্ই একমাত্র অনাদি সত্তা আর যা কিছু রয়েছে সবই পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছে, এটাই তাদের কাছে শেষ কথা।

মুসলিম চিন্তার ইতিহাসে এক পর্যায়ে এসে দেখা গেল অনাদিত্ব বিষয়ে নতুনভাবে কিছু চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে। সে থেকে মুসলিম-দর্শনে বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের দর্শনে, এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এ প্রবন্ধে আমরা অনাদিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার চেষ্টা করব এবং তাদের বক্তব্যসমূহ পর্যালোচনা করব।

*লেখক : প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মুতাযিলা মতবাদ

মুতাযিলারা মুসলিম-দর্শনে যুক্তিবাদী হিসাবে পরিচিত। তাঁরা প্রতিটি বিষয়কে যুক্তির আলোকে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছেন। প্রত্যাদেশ হিসাবে কুরআনকে স্বীকার করে নেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা এর আক্ষরিক অর্থসমূহ হুবহু গ্রহণ করতে সম্মত নন।[১] যে কারণে মুসলিম-দর্শনের ইতিহাসে তাঁরা ইসলামের বুদ্ধিবাদী (rationalist of Islam) নামে পরিচিত। অনাদিত্ব বিষয়ক তাঁদের আলোচনার সূত্রপাত ঘটে যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই। তবে তা এসেছে পরোক্ষভাবে। তাঁদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল আল্লাহ্‌র একত্ব বা তাওহীদকে–যা ইসলামের মূলনীতি–যুক্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা। একইভাবে তাঁরা আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচারের (আদ্‌ল) এর ধারণাকেও যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। সে কারণেই তাঁরা নিজেদের আল্লাহ্‌র একত্ব ও ন্যায়বিচারের পক্ষাবলম্বনকারী বা রক্ষক (আহ্‌ল আত্-তাওহীদ ওয়াল আদ্‌ল) হিসাবে অভিহিত করে থাকেন।[২]

মুতাযিলারা সহজ ও সরল অর্থে আল্লাহ্‌র একত্বের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌র সত্তা (জাত) থেকে পৃথকভাবে অস্তিত্বশীল গুণাবলিকে তাঁরা স্বীকার করেননি। এ ধরনের স্বীকৃতি, তাঁদের মতে, আল্লাহ্‌র একত্বের ধারণার সাথে সংঘাতপূর্ণ। কেননা, এতে আল্লাহ্ ছাড়া আরও বহু অনাদি সত্তার ধারণার উদ্ভব ঘটবে।[৩] মুতাযিলা মতবাদের প্রধান বিরোধিতাকারী আশ্‌আরিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আবুল হাসান আল্-আশ্'আরী (মৃ. ৩২৪ হি./৯৩৫ খ্রি.) এর মতে মুতাযিলারা আল্লাহ্‌র ভিন্নতা ও অতিবর্তিতার পক্ষে অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র একত্বের ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।

মুতাযিলারা এ বিষয়ে অভিন্ন মত পোষণ করেন যে, আল্লাহ্ সবকিছু থেকে আলাদা এবং তাঁর শ্রবণ ও দর্শন ক্ষমতা একইভাবে ভিন্নতর। তিনি দেহবিশিষ্ট নন, তিনি প্রেতাত্মা, শব, আকার, মাংসপিণ্ড, রক্ত, দ্রব্য এসব কিছুই নন। তিনি অবান্তর লক্ষণও নন এবং বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ, উষ্ণ, শীতল, আর্দ্রতা, শুষ্কতা, উচ্চতা, প্রশস্ততা অথবা গভীরতাসম্পন্ন নন। তিনি অবিভাজ্য এবং স্থান ও সময়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত। সৃষ্ট বস্তুসমূহের গুণাবলি, যাতে সাপেক্ষতা রয়েছে সেগুলো তাঁর ওপর আরোপযোগ্য নয়। তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষণ সম্ভব নয় অথবা মানুষের পক্ষে তাঁকে আত্মীকরণও সম্ভব নয়। তিনি সর্বদাই প্রথম, সমগ্র সাপেক্ষ বস্তুসমূহের পূর্ববর্তী।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তিনি সবসময়ই জ্ঞানী, ক্ষমতাবান, জীবন্ত এবং তা সবসময় বজায় থাকে। কোন দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পারে না, কল্পনা তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না, তিনিই একমাত্র অনাদি সত্তা, তিনি ছাড়া আর কোন অনাদি সত্তা নেই এবং কোন দৈবশক্তি বা সঙ্গী তাঁর রাজ্যে তাঁর শরীক নয়।[৪]

মুতাযিলারা উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র একত্বকে সুদৃঢ় যৌক্তিক ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। তাঁদের অভিমত হল আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুকে অনাদি হিসাবে গ্রহণ করলে তা হবে তাওহীদের মূলনীতির পরিপন্থী। সেই কারণেই তাঁরা আল্লাহ্‌র অনাদি গুণসমূহের ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেন। তাঁদের মতে আল্লাহ্‌র সত্তার মধ্যেই জ্ঞান, ক্ষমতা ও জীবন রয়েছে, এগুলো অনাদি গুণ বা ধারণা হিসাবে তাঁর মধ্যে নিহিত নেই। যদি এসব গুণ আল্লাহ্‌র অনাদিত্বের অংশ হয়, তাহলে তা তাঁর সত্তারও অংশীদার হবে।[৫] সে কারণেই মুতাযিলারা সর্বসম্মতভাবে অনাদিত্ব ব্যতীত আল্লাহ্‌র অনাদি গুণাবলির ধারণা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন।[৬]

মুতাযিলারা যে যুক্তিতে আল্লাহ্‌র গুণাবলির স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিলেন, ঠিক একই যুক্তিতে তাঁরা কুরআনকে নিত্য বা চিরন্তন বলে মেনে নেননি। এ প্রসঙ্গে তাঁদের অভিমত হল কুরআনে আল্লাহ্‌কে একমাত্র অনাদি সত্তা হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।

অতএব, কুরআনকে যদি আল্লাহ্‌র কালাম হিসাবে নিত্য ধরে নেওয়া হয় তবে তা হবে কুরআনে উল্লিখিত আল্লাহ্‌র একত্বের ধারণার পরিপন্থী। অতএব, আল্লাহ্‌র বাণী হিসাবে কুরআনকে তাঁরা অনাদি হিসাবে মেনে নেননি। তাঁদের অভিমত হল কুরআন সৃষ্ট।[৭]

প্রখ্যাত মুতাযিলা চিন্তাবিদ আবুল হুযায়েল এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আল্লাহ্‌র বাণীর দু'টি দিক রয়েছে : [কুরআন অনুযায়ী] প্রাথমিক আদেশ (কুন) এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ জগৎ সৃষ্টি করেছেন যাতে রয়েছে হওয়ার নির্দেশ এবং পরবর্তী বা দ্বিতীয় আদেশ দ্বারা বিশেষ বিশেষ বস্তুসমূহের সৃষ্টি বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রথমোক্তটি আল্লাহ্‌র অন্তর্বর্তী হতে পারে না। কেননা, তিনি অবান্তর লক্ষণসমূহের ধারক হতে পারেন না, তিনি পৃথিবীর ধারণকারী হতে পারেন না। কারণ, তখন পর্যন্ত পৃথিবী অস্তিত্বেই আসেনি।'[৮]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আন্‌নায্‌যামসহ অন্য চিন্তাবিদরা মানুষের কথা ও আল্লাহ্‌র বাণীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন, প্রথমটি হল অবান্তর গুণ, আর অপরটি হল শ্রবণযোগ্য শব্দ যার কারণ আল্লাহ্‌ স্বয়ং।[৯]

আল্লাহ্‌র বাণী বিষয়ক মুতাযিলাদের বিভিন্নমুখী আলোচনা, পর্যালোচনা সত্ত্বেও তাঁদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাণীর সৃষ্টিশীলতা অপরিবর্তিত থাকে। এ বিষয়ে মুতাযিলা চিন্তাবিদরা সবাই একমত যে, কুরআন সৃষ্ট, একে কোন অবস্থাতেই অনাদি বলা চলে না। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওপর হযরত জিবরাঈলের মাধ্যমে কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে তা সংরক্ষিত ফলকে (লাওহে মাহফুজে) ছিল[১০]– মুসলমানদের এ সাধারণ ধর্মীয় বিশ্বাসকে মুতাযিলারা গ্রহণ করেছিলেন। কুরআন অতীন্দ্রিয় পর্যায় থেকে মানবীয় দু'টি পর্যায় অতিক্রম করেছে : লিপিবদ্ধকরণ এবং পঠন; মুতাযিলা মত অনুযায়ী সকল পর্যায়েই কুরআন সৃষ্ট।[১১] উল্লেখ্য যে, সামগ্রিকভাবে মুতাযিলারা ছাড়াও খারেজি এবং মুরজিয়া, শিয়া ও জাহেমিয়া সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই কুরআন সৃষ্ট– এ তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন।[১২]

কুরআন যে অনাদি নয়, সৃষ্ট– এ নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা, পর্যালোচনা দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলে। তবে খলিফা আল মামুন এ বিষয়ে মুতাযিলা মতবাদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। ৮২৭ এবং ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে সরকারি ফরমানে কুরআনকে সৃষ্ট বলে ঘোষণা করা হয়। এতে বিভিন্ন ধর্মীয় মহলে, বিশেষ করে ধর্মীয় বিশ্বাসকে যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণে আনার বিপক্ষে অবস্থানকারী মহলে, বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। খলিফা আল-মামুনের কুরআনের সৃষ্টি বিষয়ক মতবাদ তাঁর দুই উত্তরসূরি আল-মুতাসিম এবং আল-ওয়াসিক গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহকে যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণের আওতায় আনার নীতির প্রধান বিরোধিতাকারীদের অন্যতম ছিলেন মালিক ইবনে আনাস (মৃ. ৭৯৫ খ্রি.)। তাঁর অভিমত হল ধর্মীয় বিশ্বাসকে 'কীভাবে' সে প্রশ্ন উত্থাপন না করেই (বিলাকায়ফা) গ্রহণ করতে হবে। সেই ধারাবাহিকতায় প্রখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব আহমদ ইবনে হাম্বাল (মৃ. ৮৫৫ খ্রি.) মুতাযিলাদের কুরআনের সৃজন বিষয়ক মতাবাদের তীব্র বিরোধিতা করেন।[১৩]

আল মুতাওয়াক্কিল ৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে খলিফার আসনে সমাসীন হওয়ার পর কুরআনের সৃজন বিষয়ক রাষ্ট্রীয় ফরমান প্রত্যাহার করা হয়।[১৪] মুতাযিলারা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারালেও তাঁদের চিন্তাধারার প্রভাব ইসলামী চিন্তাজগতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ফেলেছিল। পরবর্তী চিন্তাবিদরা, এমনকি এর বিরোধিতাকারীরাও এর প্রভাবমুক্ত হতে পারেননি। মুতাযিলারা যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন পরবর্তী চিন্তাবিদরা, এমনকি ধর্মতত্ত্ববিদরা পর্যন্ত এসব বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। অনাদিত্ব বিষয়ক আলোচনাও মুসলিম-দর্শনে একইভাবে অব্যাহত থাকে।

আশ্'আরিয়া

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অতি যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আশ্'আরিয়া সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। কিন্তু আশ্'আরিয়া অবস্থানকে সম্পূর্ণ রক্ষণশীল একটি মতবাদ হিসাবে গণ্য করা যায় না। মুতাযিলারা ধর্মীয় বিশ্বাস ও নীতিমালাকে সম্পূর্ণভাবে যুক্তিনির্ভর করার প্রচেষ্টা চালান, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই অনাদিত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের অবস্থান ধর্মীয় ঐতিহ্যপন্থী ও সংরক্ষণবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সংঘাতপূর্ণ হয়ে ওঠে। আশ্আরিয়ারা ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহকে সম্পূর্ণ যুক্তির আওতায় এনে সে অনুযায়ী এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিরোধী হলেও ধর্মীয় বিষয়ে প্রত্যাদেশের (ওহী) নিয়ন্ত্রণে সীমিত আকারে যুক্তি প্রয়োগের বিরোধী নন। এক্ষেত্রে তাঁদের অভিমত অতি সংরক্ষণবাদী ও সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আক্ষরিক অর্থে প্রত্যাদেশকে গ্রহণের পক্ষ অবলম্বনকারীদের থেকে ভিন্নতর। আল্-আশআরীর মতে, পবিত্র কুরআনে উপমা ও অবরোহ পদ্ধতিতে যুক্তি প্রয়োগের বহু নজির রয়েছে।[১৫] আল্লাহ্র গুণাবলি ও কুরআনের সৃজন প্রশ্নে আল্-আশারীর মত মুতাযিলাদের মত থেকে যেমন ভিন্নধর্মী, তেমনিভাবে স্থূল নরাত্মারোপবাদী (মুজাস্সিমুন) বা কট্টর আক্ষরিকপন্থীদের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।[১৬]

আশ্'আরিয়াদের মতে আল্লাহ্র যেসব সাধারণ গুণ রয়েছে সেগুলোকে দু' শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : ক. নঞর্থক গুণাবলি (সিফাত-ই-সাল্বীয়াহ) এবং খ. অস্তিত্বমূলক বা সদর্থক গুণাবলি (সিফাত-ই-উজূদিয়াহ), যাকে তাঁরা বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলি (সিফাত-ই-আকলিয়া) বলেও অভিহিত করেন। এগুলোর সংখ্যা হল সাত : জ্ঞান, ক্ষমতা, ইচ্ছা, শ্রবণ, দর্শন ও বাচন।[১৭]

কট্টরপন্থী সিফাতিয়ারা আল্লাহ্র যে সব গুণ দৈহিক অস্তিত্ব নির্দেশ করে, সেগুলোকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এর বিরুদ্ধে আশ্'আরিয়াদের অভিমত হল,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আপাতদৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র দেহ নির্দেশক কিছু গুণের উল্লেখ থাকলেও এগুলোকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা যাবে না। এগুলোকে 'কীভাবে' সে প্রশ্ন উত্থাপন না করে (বিলা কায়ফা) এবং অন্য কোন কিছুর সাথে তুলনা না করে (বিলা তাশবীহ) বিশ্বাস করতে হবে।[১৮]

আশ্'আরিয়ারা এখানে আল্লাহ্‌র গুণাবলি সংক্রান্ত যে তত্ত্ব উপস্থাপন করেন সেটি হল আল্লাহ্‌র গুণাবলি অনুপম এবং সেগুলো সৃষ্ট সবকিছু থেকে মৌলিকভাবেই ভিন্নতর এবং সে কারণেই গুণাবলির সাথে কোন কিছুরই তুলনা চলে না। তাঁদের এ মতবাদ মুখালাফা বা চূড়ান্ত ভিন্নতা নামে পরিচিত। এ মতবাদ অনুযায়ী কোন গুণ বা শব্দ যদি আল্লাহ্‌র ওপর আরোপিত হয় তবে তার অর্থ হবে আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অনুপম অর্থাৎ সৃষ্ট কোন কিছুর ওপর এর প্রয়োগ হলে সাধারণত যে অর্থে তা ব্যবহৃত হয়, তা থেকে এ প্রয়োগ সম্পূর্ণ আলাদা। মুখালাফা মতবাদের কারণে আশ্'আরিয়ারা নিজে থেকে আল্লাহ্‌র ওপর কোন গুণ আরোপের বিরোধী। শুধু সে সব গুণই আল্লাহ্‌র ওপর আরোপযোগ্য যেগুলোর সুস্পষ্ট উল্লেখ কুরআন মজিদে রয়েছে। আল্লাহ্‌র গুণাবলির সাথে সৃষ্ট সকল কিছুর গুণাবলির পার্থক্য শুধু পরিমাণগত নয়, গুণগতও। অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে তা সম্পূর্ণ ভিন্নতর।[১৯]

মুতাযিলা মতবাদের বিরোধিতা করে আল্-'আশআরি বলেন যে, আল্লাহ্‌র গুণাবলি অনাদিভাবে তাঁর মধ্যে নিহিত এবং সেগুলো তাঁর সত্তার অতিরিক্ত।[২০] এসব গুণ হল অনাদি। তবে এগুলো এবং আল্লাহ্‌র সত্তা অভিন্ন– মুতাযিলাদের মত এ কথা যেমন বলা যায় না, একইভাবে এগুলো ভিন্ন এ কথাও বলা যায় না। কারণ, এতে কেউ স্বয়ং আল্লাহ্ ছাড়া আল্লাহ্‌র গুণাবলির নিকট প্রার্থনা করে বসতে পারে, যা হবে উদ্ভট।[২১]

আশ্'আরিয়াদের মতে মুতাযিলাদের মত আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলিকে এক ও অভিন্ন বলে বিবেচনা করা হলে তা হবে আল্লাহ্‌র গুণাবলিকে অস্বীকার করার শামিল। তবে তাঁরা এ বলেননি যে, এসব অনাদি গুণ সম্পূর্ণভাবেই আল্লাহ্ থেকে পৃথক। এ ধরনের ধারণা অনাদির ক্ষেত্রে বহুত্বের সূত্রপাত ঘটাবে এবং তা হবে আল্লাহ্‌র একত্বের পরিপন্থী। সেজন্যই তাঁরা বলেন যে, আল্লাহ্‌র গুণাবলি এক অর্থে আল্লাহ্‌র সত্তার অন্তর্ভুক্ত, অপর অর্থে তাঁর সত্তা বহির্ভূত।[২২] আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে গুণাবলির সম্পর্ক বিষয়ক যে বিতর্ক চলছিল তার সমাপ্তি টানতে গিয়ে আল-আশ্'আরি বলেন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যে, আল্লাহ্‌র সত্তা এক, তবে তাঁর মধ্যে অসংখ্য গুণ নিহিত। এগুলো তাঁর সত্তা থেকে যেমন অভিন্ন নয়, আবার সম্পূর্ণভাবে ভিন্নও নয়।[২৩] আল্লাহ্‌র গুণাবলি বিষয়ক বিতর্কে আল-আশ্‌'আরিয়াদের অবস্থান যদিও মুতাযিলাদের থেকে ভিন্নতর, তথাপি তাঁরা মুতাযিলাদের প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত নন। আশ্‌'আরিয়ারা আল্লাহ্‌র গুণাবলিকে অনাদি বলেছেন ঠিকই, কিন্তু এগুলোর স্বতন্ত্র অবস্থান যে তাওহীদের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না, সে সম্পর্কেও তাঁরা সচেতন ছিলেন। সেই প্রেক্ষিতেই তাঁরা একটি মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করেন।

কুরআনের নিত্যতা বিষয়ক বিতর্কে মুসলিম চিন্তাবিদদের জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। ধর্মীয় সংরক্ষণবাদীদের মতে কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম হিসাবে অনাদি। এর জন্য কোন প্রকার যৌক্তিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। অপরদিকে মুতাযিলারা যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আল্লাহ্‌র সত্তা ছাড়া অন্য কোন কিছুকেই অনাদি হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী নন। তাঁদের মতে কুরআন সৃষ্ট। আশ্‌'আরিয়াদের মতে বাচন (কালাম) হল আল্লাহ্‌র সাতটি বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলির অন্যতম এবং যেহেতু আল্লাহ্‌র গুণাবলি অনাদি, আল্লাহ্‌র বাচন অর্থাৎ আল-কুরআন একইভাবে অনাদি। তবে কুরআনের অনাদি হওয়া বিষয়ক আশ্‌'আরিয়াদের অবস্থানকে মধ্যপন্থী হিসাবে অভিহিত করা যায়। কেননা, চরম গোঁড়াপন্থী সম্প্রদায়, বিশেষ করে হাম্বলি ও জাহেরিদের মতে আল্লাহ্‌র কালাম অর্থাৎ কুরআন যেসব অক্ষর, শব্দ ও ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত সেগুলোও অনাদি। এমনকি হাম্বলি সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এমন মতও পোষণ করতেন যে, কুরআনের কভারও অনাদি।[২৫]

অপরদিকে মুতাযিলারা ছাড়া শিয়াদের একটি অংশ কুরআনকে সৃষ্ট ও অনিত্য বলে মনে করতেন। তাঁদের যুক্তি হল কুরআন বিভিন্ন অংশ নিয়ে সংকলিত হয়েছে এবং এর অংশসমূহকে ক্রমানুসারে বিন্যাস করা হয়েছে। অতএব, যা কিছু বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে এভাবে সংকলিত হয় তা অনিত্য হতে বাধ্য।[২৬] এ প্রসঙ্গে আশ্‌'আরিয়াদের বক্তব্য হল কুরআন সংকলনের জন্য যে শব্দাবলি ও ধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে তা আল্লাহ্‌র সত্তায় নিহিত নেই। এক্ষেত্রে তাঁরা কুরআনের বাহ্যিক ও ভাষায় প্রকাশিত মূর্ত দিক এবং যথার্থ ও স্বতঃঅস্তিত্বশীল অর্থের (self-subsisting meaning) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। তাঁদের মতে শব্দাবলি ও ধ্বনি দ্বারা প্রকাশিত কুরআন নিঃসন্দেহে অনিত্য, কিন্তু কুরআন এর অর্থের ক্ষেত্রে অসৃষ্ট ও নিত্য। স্বতঃঅস্তিত্বশীল

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থ এটি অনাদিকাল থেকে আল্লাহ্‌র সত্তায় নিহিত। এই অর্থসমূহ প্রকাশিত হয়েছে; এর ভাষায় প্রকাশিত রূপ হল অনিত্য ও সৃষ্ট। এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁরা বলেন, অর্থ এক থেকেও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তি বা জাতির দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হতে পারে। তাঁরা আরো উল্লেখ করেন যে, এই অর্থ হল জ্ঞান ও ইচ্ছা ছাড়া অপর আরেকটি গুণ, যা অনাদিকাল থেকে আল্লাহ্‌র সত্তায় নিহিত, সে কারণেই তা অনাদি।[২৭]

এ মতের সমর্থনে আশ'আরির যুক্তিসমূহ হল :

১. কুরআন আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জ্ঞান। অতএব, এটি আল্লাহ্‌র জ্ঞান সংক্রান্ত গুণের–যা অনাদি ও অসৃষ্ট–সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। অতএব, কুরআনও একইভাবে অনাদি ও অসৃষ্ট।

২. আল্লাহ্‌ কুন (হও) শব্দ দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এ শব্দটি কুরআন মজিদে আছে, যা সৃষ্ট কোন কিছু হতে পারে না; অন্যথায় একটি সৃষ্ট শব্দ স্রষ্টায় পরিণত হবে, যা উদ্ভট। অতএব, আল্লাহ্‌র কথা সৃষ্ট হতে পারে না, অন্য কথায় এটি অনাদি।

৩. কুরআন সৃষ্টি (খাল্‌ক) ও আদেশ (আম্‌র) এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। যেমন কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, 'সৃষ্টি এবং আদেশ কি একমাত্র তাঁর নয়?' অতএব, আল্লাহ্‌র আদেশ, তাঁর কথা বা কালাম সুস্পষ্টভাবে সৃষ্টবস্তুসমূহ (মাখলূক) থেকে আলাদা, সে কারণে তা অসৃষ্ট ও অনাদি।

৪. আল্লাহ্‌ মূসা (আ.)-কে বলেন, 'আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির মধ্য থেকে বেছে নিয়েছি আমার রাসূল এবং আমার কথা হিসাবে।' এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে আল্লাহ্‌র বচন রয়েছে। আবারও আল্লাহ্‌ মূসা (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমার প্রভু।' এখন যেসব শব্দ দ্বারা হযরত মূসাকে সম্বোধন করা হয়েছে সেগুলো যদি সৃষ্ট হয়, তবে এ থেকে বুঝা যাবে যে, কোন সৃষ্ট বস্তু ঘোষণা করেছে যে, তিনি মূসার প্রভু (আল্লাহ্‌), যা উদ্ভট। অতএব, আল্লাহ্‌র কথা অবশ্যই অনাদি হবে। মুতাযিলাদের কুরআনের সৃজন সংক্রান্ত যুক্তিসমূহ শুধু প্রকাশিত কুরআনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, আসল কুরআনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।[২৮]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আশ্'আরিয়ারা কুরআনের নিত্যতার পক্ষে আলোচনা করেছেন এবং এতে তাঁরা নানাবিধ যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। যদিও তাঁদের অভিমত ইসলামের যুক্তিবাদী' হিসাবে পরিচিত মুতাযিলাদের মতবাদ থেকে ভিন্নতর, তা সত্ত্বেও বক্তব্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তাঁরা যৌক্তিক পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন।

দার্শনিক সম্প্রদায়

মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে অনেকের রাচনাবলিতে অনাদিত্ব বিষয়ক আলোচনা বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। মুসলিম দার্শনিকরা (ফালাসিফা) গ্রিক-দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। গ্রিক-দর্শন, বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের দর্শনের সাথে ইসলামি চিন্তাধারার একটি যোগসূত্র স্থাপন এবং সমন্বয় সাধন ছিল তাঁদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। জগতের অনাদি হওয়ার যোগসূত্র বিষয়ক মুসলিম দার্শনিকদের মতবাদ অ্যারিস্টটলের জগৎ বিষয়ক মতবাদের প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল। অ্যারিস্টটলের মতে জগৎ অনাদি। তিনি শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে– এ মতবাদে বিশ্বাসী নন, এমনকি তিনি গতিকেও অনাদি বলে বিবেচনা করতেন।[২৯] অপরদিকে ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী জগৎ সৃষ্ট। আল্লাহ্ জগতের স্রষ্টা। অ্যারিস্টটলের দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত গাযালি-পূর্ববর্তী মুসলিম দার্শনিকরা, বিশেষ করে আল-ফারাবি ও ইবনে সিনা, জগৎ বিষয়ক অ্যারিস্টটলীয় মতবাদের সাথে ইসলামি মতবাদের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চালান। তাঁরা জগৎকে সৃষ্ট বলে উল্লেখ করেও একে অনাদি হিসাবে দাবি করেন। এ বিষয়ে তাঁদের যুক্তিসমূহ একত্র করে আল-গাযালি তাঁর তাহাফুত আল-ফালাসিফা গ্রন্থে উপস্থাপন করেন। জগতের অনাদি হওয়া বিষয়ক আলোচনা উক্ত গ্রন্থের প্রায় এক-চতুর্থাংশ স্থান দখল করে রেখেছে। আল-গাযালী জগতের অনাদিত্বের পক্ষে দার্শনিকদের যুক্তিসমূহ প্রথমে উপস্থাপন করে পরে তা খণ্ডনের চেষ্টা করেন।

দার্শনিদের প্রথম যুক্তি হল অনাদি বা নিত্য থেকে অনিত্য কিছু উদ্ভূত হওয়া সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। অর্থাৎ আল্লাহ্ যে অনাদি সত্তা তা ধর্মীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য। এ বিষয়ে কারও ভিন্নমত নেই। সে সূত্র ধরেই দার্শনিকরা তাঁদের প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ জগতের অনাদিত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন, যদি এমন একটি পর্যায় ধরে নেওয়া হয় যখন পর্যন্ত আল্লাহ্ থেকে জগৎ উদ্ভূত হয়নি। এর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পেছনে যুক্তি হিসাবে ভাবা হবে যে, এর অস্তিত্ব শুধু সম্ভাবনার পর্যায়ে ছিল। যখন পরবর্তীকালে জগৎ অস্তিত্বে এল, তখন একে ব্যাখ্যা করতে হলে দার্শনিদের মতে যে কোন একটি বিকল্পকে স্বীকার করে নিতে হবে, হয় নির্ধারক উদ্ভূত হয়েছে অথবা হয়নি। যদি নির্ধারক উদ্ভূত না হয়, তবে জগৎ শুধু সম্ভাবনার স্তরে থেকে যেত, যে অবস্থায় পূর্বে ছিল। কিন্তু যদি নির্ধারক উদ্ভূত হয় তবে প্রশ্ন উঠবে এটি কার দ্বারা উদ্ভূত হয়েছে এবং কেন এখন উদ্ভূত হল, পূর্বে কেন হয়নি? অতএব, নির্ধারকের উদ্ভূত হওয়া নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। দার্শনিকদের অভিমত হল যেহেতু অনাদি সর্বাবস্থায় একই রকম, সেজন্য হয় এ থেকে কোন কিছুই উদ্ভূত হবে না অথবা যা কিছু উদ্ভূত হবে তা অবিরামভাবে উদ্ভূত হতেই থাকবে।[৩০] এভাবে দার্শনিকরা বলতে চাচ্ছেন, জগতের উদ্ভূত হওয়া স্বীকার করলে নানাবিধ যৌক্তিক সমস্যা দেখা দেয়। যেমন আল্লাহ্ কেন জগৎ আগে সৃষ্টি করেননি, এর আগে কি তিনি জগৎ সৃষ্টি করতে অপারগ ছিলেন? অথবা জগৎ পূর্বে সৃষ্টি হওয়া কি অসম্ভব ছিল? এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ্ পূর্বে জগৎ সৃষ্টিতে অক্ষম ছিলেন পরে সক্ষমতা অর্জন করেছেন অথবা জগৎ অসম্ভাব্যতা থেকে সম্ভাব্যতায় এসেছে। এ দু'টি ব্যাখ্যাই দার্শনিকদের মতে অযৌক্তিক। দার্শনিকরা আরও বলেন যে, এমন দাবিও করা যাবে না যে, জগৎ উদ্ভূত হওয়ার পূর্বে এর উদ্দেশ্য ছিল না অথবা আল্লাহ্র জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা ছিল না, পরবর্তীকালে উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার উন্মেষ ঘটেছে। এক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার উদ্ভূত হওয়া সম্পর্কে নতুনভাবে প্রশ্নের উদ্ভব হবে। যদি জগৎ উদ্ভূত হওয়াকে আল্লাহ্র কর্ম হিসাবে বিবেচনা করা হয় সে ক্ষেত্রেও প্রশ্ন জাগবে : কেন এখন, এবং পূর্বে নয় কেন? এর কারণ কি উপায় অথবা ক্ষমতা অথবা উদ্দেশ্য অথবা প্রকৃতির অনুপস্থিতি? নতুনভাবে ইচ্ছা যে উদ্ভূত হতে পারে না সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এসব যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে দার্শনিকরা সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, অনাদি বা নিত্য থেকে অনিত্য কোন কিছু উদ্ভূত হওয়া সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। যেহেতু আল্লাহ্ অনাদি এবং অনাদি হওয়ার কারণে তাঁর মধ্যে কোন ধরনের পরিবর্তনই সম্ভব নয়। জগতের যেহেতু কোন বিশেষ সময়ে শুরু হওয়া অসম্ভব এ থেকে জগৎ যে অনাদি তা নিঃসৃত হয়।[৩১]

এটি হল জগতের অনাদিত্ব প্রমাণে দার্শনিকদের প্রথম যুক্তি। আল্-গাযালি দার্শনিকদের এ যুক্তিকে সবচেয়ে চাতুর্যপূর্ণ যুক্তি বলে অভিহিত করেন।[৩২] তাঁর মতে দার্শনিকরা আধিবিদ্যক যত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন এর সবগুলোই

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উপরিউক্ত যুক্তিটির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এখানে তাঁরা বিষয়টিকে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন যা অন্য কোন সমস্যার ক্ষেত্রে হয়নি।[৩৩]

আল্-গাযালি জগৎকে অনাদি হিসাবে মেনে নিতে রাজী নন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে দার্শনিকদের প্রথম যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি বলেন, কীভাবে দার্শনিকরা এ যুক্তিকে খণ্ডন করবেন– যদি কেউ বলে, অনাদি ইচ্ছা যখন চেয়েছেন তখনই জগৎ অস্তিত্বে এসেছে, যতক্ষণ চাননি ততক্ষণ পর্যন্ত তা অস্তিত্বে আসেনি। যখনই তিনি চেয়েছেন ঠিক তখনই জগৎ শুরু হয়েছে। আল্-গাযালির বক্তব্য হল অনাদি ইচ্ছার পক্ষে বিশেষ সময়ে জগৎ সৃষ্টিতে কোন বাধা নেই।[৩৪] আল্-গাযালি অনাদিত্বের পক্ষে উপস্থাপিত দার্শনিকদের প্রথম যুক্তিটিকে নানাভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনা করে বলতে চাচ্ছেন যে, অনাদি বা নিত্য থেকে অনিত্য কোন কিছু উদ্ভূত হওয়া সম্ভব। এমনকি দার্শনিকদেরও এটা মেনে নিতে হবে। কেননা, জগৎ অনিত্য বা অস্থায়ী ঘটনাবলিতে ভরপুর। এর একটিকে অন্যটির কারণ হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। সেভাবে কার্য-কারণ শৃঙ্খল এক জায়গায় গিয়ে সমাপ্ত হয়। দার্শনিকরাও তাঁদের জগৎ সম্পর্কিত তত্ত্বে কার্যকারণ শৃঙ্খল যেখানে সমাপ্ত হয়েছে তাঁকে স্রষ্টা বলে অভিহিত করেছেন; তিনি হলেন অনিবার্য সত্তা, সমগ্র সম্ভাব্য বস্তু তাঁর ওপর নির্ভরশীল। অতএব, ক্ষণস্থায়ী ঘটনাবলির শৃঙ্খল যেখানে গিয়ে সমাপ্ত হয় তাঁকেই অনাদি বলে অভিহিত করতে হয়। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, অনাদি থেকে ক্ষণস্থায়ী বা অনিত্য কোন কিছু উদ্ভূত হওয়া সম্ভব।[৩৫]

দার্শনিকরা জগতের অনাদিত্বের পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তিটি উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন, যাঁরা আল্লাহ্কে জগতের পূর্ববর্তী এবং জগৎকে পরবর্তী বলে বিশ্বাস করেন তাঁরা এর ব্যাখ্যা দু'টি বিকল্পের যে কোন একভাবে করতে বাধ্য। প্রথম বিকল্পটি হল আল্লাহ্ সত্তাগত দিক থেকে জগতের পূর্ববর্তী, কিন্তু সময়গত দিক থেকে নন। যেমন 'এক' 'দুই' এর পূর্ববর্তী। এ পূর্ববর্তিতা প্রকৃতিগত, যদিও উভয়ই একই সময়ে অস্তিত্বশীল। দার্শনিকরা অন্যভাবেও এর ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করতে পারেন। তাঁদের মতে কারণ কার্যের পূর্ববর্তী, কিন্তু তারা একই সময়ে অবস্থান করে। যেমন মানুষের হাঁটার সাথে ছায়ারও হাঁটা। প্রথমটি দ্বিতীয়টির কারণ হওয়া সত্ত্বেও কালগত দিক থেকে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দার্শনিকরা আল্লাহ্ ও জগতের মধ্যে সম্পর্ক

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বিষয়ক এ বিকল্পটি গ্রহণ করে বলতে চান, আল্লাহ্ অনাদি হলে জগৎও অনাদি হবে। এটি সম্ভব নয় যে, একটি অনাদি হবে আর অপরটি হবে অনিত্য।[৩৬]

এর পরে দার্শনিকরা আল্লাহ্র পূর্ববর্তিতা সম্পর্কে দ্বিতীয় বিকল্পটি আলোচনা করেন। দ্বিতীয় বিকল্পটি হল আল্লাহ্ এবং জগতের মধ্যে সময়গত পার্থক্য। অর্থাৎ আল্লাহ্ সময়ের দিক থেকে পূর্ববর্তী এবং জগৎ পরে আবির্ভূত হয়েছে। অর্থাৎ পার্থক্যটি শুধু সত্তাগত নয়, সময়গতও বটে। এ বিকল্পটি গ্রহণ করলে যে যৌক্তিক জটিলতা সৃষ্টি হয় দার্শনিকরা তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহ্ যদি সময়গত দিক থেকে জগতের পূর্ববর্তী হন তবে এ থেকে আরেকটি বিষয়ের উদ্ভব হবে, তা হল জগৎ এবং সময় অস্তিত্বে আসার পূর্বে এমন একটি সময় ছিল যখন জগৎ অস্তিত্বশীল ছিল না। ঐ সময়ে অর্থাৎ যখন জগৎ অস্তিত্বশীল ছিল না সেই সময়, জগৎ অস্তিত্বশীল হওয়ার পরবর্তী সময়ের পূর্ববর্তী। এ থেকে এটা নিঃসৃত হয় যে, আল্লাহ্ এমন একটি সময়ে অস্তিত্বশীল ছিলেন যখন জগৎ অস্তিত্বে আসেনি এবং জগৎ অস্তিত্বে আসার সাথে সাথেই সেই সময়টির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু এ সময়টির কোন শুরু ছিল না। এ থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, সময়ের পূর্বে একটি অসীম সময় ছিল। দার্শনিকদের মতে তা হবে পরস্পর বিরোধী। দার্শনিকরা এ কারণে বলেন, সময়ের সূত্রপাত হয়েছে এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব। সময়কে অনাদি হিসাবে মেনে নেওয়ার অর্থ হল গতির পরিমাপককে অনাদি হিসাবে মেনে নেওয়া এবং একই যুক্তিতে গতিও হবে অনাদি। গতি অনাদি হলে গতি যার গতি অর্থাৎ জগৎ, সেটিও হবে অনাদি।[৩৭]

উক্ত আলোচনা থেকে যে বিষয়টি বেরিয়ে এসেছে তা হল দার্শনিকরা জগতের পূর্ববর্তী হিসাবে যে দু'টি বিকল্পের উল্লেখ করেছেন সেই বিকল্প দু'টি পর্যালোচনার মাধ্যমে তাঁরা দেখাতে চাচ্ছেন যে, প্রথম বিকল্পটি অর্থাৎ আল্লাহ্র পূর্ববর্তিতা সত্তাগত, সময়গত নয়– যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয় বিকল্পটি অর্থাৎ আল্লাহ্ সময়গত দিক থেকে জগতের পূর্ববর্তী– গ্রহণ করলে যৌক্তিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। সেজন্য দ্বিতীয় বিকল্পটি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। শেষ পর্যন্ত এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ্ যদি সময়ের দিক থেকে জগতের পূর্ববর্তী না হন, তাহলে আল্লাহ্ ও জগৎ উভয়েই অনাদি হয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আল্-গাযালি দার্শনিকদের এ ব্যাখ্যা মানতে রাজী নন। তাঁর মতে সময় শুরু হয়েছে এবং তা সৃষ্ট। যখন বলা হয়, আল্লাহ্ জগৎ ও সময়ের পূর্ববর্তী, তখন এর দ্বারা এটি বুঝানো হয় যে, তিনি ছিলেন, জগৎ ছিল না, পরবর্তীকালে আল্লাহ্ ও জগৎ উভয়েই বিদ্যমান। 'তিনি ছিলেন এবং জগৎ ছিল না' এর অর্থ হল জগতের অস্তিত্বের পূর্বে তাঁর সত্তাই একমাত্র সত্তা ছিল। এ উক্তিকে বুঝানোর জন্য অন্য কোন বস্তুর ধারণার প্রয়োজন নেই। যদি কল্পনায় তৃতীয় কোন বস্তুর ধারণা চলে আসে তবে কল্পনার এ ভুলপথ অনুসরণ করাকে কোন গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই।[৩৮] আল্-গাযালি এভাবে দেখান যে, সময়গত দিক থেকে আল্লাহ্কে পূর্ববর্তী মেনে নিলে যৌক্তিক কোন সমস্যা সৃষ্টি হয় না। অর্থাৎ আল্লাহ্কে অনাদি মেনে নিলে জগৎকেও অনাদি মেনে নিতে হবে এমন কোন যৌক্তিক বাধ্যবাধকতা নেই।

দার্শনিকরা জগতের অনন্ত সম্ভাবনা থেকে জগৎকে অনাদি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলতে চাচ্ছেন, জগৎ সৃষ্টির পূর্বে এর সম্ভাবনা ছিল। যা অসম্ভব তা কখনও সম্ভব হতে পারে না। অতএব, জগৎ কোন সময়েই অসম্ভব ছিল না। অর্থাৎ জগৎ সব সময়ই সম্ভব ছিল। যা সব সময় সম্ভব তার কোন শুরু হতে পারে না। এভাবে তাঁরা বলতে চাচ্ছেন, জগতেরও কোন শুরু নেই, তা অনাদিকাল থেকেই আছে।[৩৯] এখানে দার্শনিকরা একটি যৌক্তিক কৌশল অবলম্বন করেছেন, অর্থাৎ জগতের সম্ভাবনাকে অনাদি প্রমাণ করে জগৎকে অনাদি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে আল-গাযালির বক্তব্য হল বাস্তবে জগতের অস্তিত্বে আসা এবং সম্ভাবনা এক জিনিস নয়। অতএব, সম্ভাবনা ছিল এর অর্থ এ নয় যে, জগৎ বাস্তবেও অস্তিত্বে ছিল। অতএব, আল্-গাযালির কাছে জগতের অনন্ত সম্ভাবনা থেকে তা অনাদি এ ধারণায় উত্তরণের যৌক্তিক প্রক্রিয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

দার্শনিকরা জগতের অনাদিত্ব বিষয়ক তাঁদের চতুর্থ যুক্তিতে বলেন যে, প্রতিটি উদ্ভূত বস্তুর পূর্বেই এর উপাদান থাকতে হবে। কোন উদ্ভূত বস্তুই উপাদান ছাড়া হতে পারে না এবং উপাদান স্বয়ং উদ্ভূত নয়। শুধু আকার, অবান্তর লক্ষণ বা গুণাবলিই উদ্ভূত। দার্শনিকরা এখানে যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন যে, জগতের উদ্ভূত হওয়ার পূর্বে সম্ভাবনা ছিল। সম্ভাবনা সাপেক্ষ গুণ। এর জন্য একটি দ্রব্য প্রয়োজন। খালি খালি সম্ভাবনা থাকতে পারে না। আর এ দ্রব্যই হল উপাদান বা জড়। অতএব, উপাদান অনাদি এবং এর অর্থ হল জগৎ অনাদি।[৪০]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আল্-গাযালি এর উত্তরে বলেন, দার্শনিকরা জগতের সম্ভাবনা সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা উদ্ভূত হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক অবধারণ থেকে। কিন্তু এ বুদ্ধিবৃত্তিক অবধারণের জন্য কোন বাস্তব অস্তিত্বশীল সত্তার প্রয়োজন নেই। আল্-গাযালি দার্শনিকদের যুক্তিকে নানাভাবে পর্যালোচনা করে দেখান যে, জগতের সম্ভাবনা সংক্রান্ত বুদ্ধিবৃত্তিক অবধারণ থেকে উপাদানের অনিবার্য উপস্থিতি নিঃসৃত হয় না। অতএব, উপাদানের অনাদি হওয়া সংক্রান্ত দার্শনিকদের অবস্থান যৌক্তিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।[৪১] এভাবে আল্-গাযালি দার্শনিকদের সর্বশেষ যুক্তিকেও নাকচ করে দেন। আল্-গাযালির বক্তব্য হল আল্লাহ্ই একমাত্র অনাদি সত্তা, জগতের অনাদিত্ব সম্পর্কিত দার্শনিকদের দাবি যৌক্তিকভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ।

প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইবনে রুশ্দ জগতের অনাদিত্ব সম্পর্কিত পূর্ববর্তী দার্শনিকদের বক্তব্য খণ্ডন করে আল্-গাযালি যেসব যুক্তি উপস্থাপন করেছেন সেগুলোর মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি প্রকারান্তরে এ সমস্যা সম্পর্কিত দার্শনিকদের অবস্থানের পক্ষেই যুক্তি প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ তিনিও জগৎকে অনাদি বলেই গণ্য করেন। আল্-গাযালি তাঁর তাহাফুত-আল-ফালাসিফা গ্রন্থে দার্শনিকদের যুক্তিসমূহ খণ্ডন করে যে বক্তব্য রাখেন ইবনে রুশ্দ সেগুলোকে খণ্ডনের উদ্দেশ্যে তাহাফুত-আল-তাহাফুত নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনিও আল্-গাযালির ন্যায় উক্ত গ্রন্থে অনাদিত্ব বিষয়ক আলোচনাকে সর্বাগ্রে স্থান দেন। ইবনে রুশ্দের বক্তব্য হল জগতের অনাদিত্ব বিষয়ক দার্শনিকদের যুক্তিসমূহ নয়; বরং দার্শনিকদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত আল্-গাযালির যুক্তিসমূহই অসঙ্গতিপূর্ণ।[৪২] ইবনে রুশ্দ বলেন, জগৎ যে আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এটি যে শূন্য থেকে সৃষ্ট এবং সময়ে সৃষ্ট এ সম্পর্কিত কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য কুরআনে নেই। তিনি বলেন, কুরআনে একটি জায়গায়ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই যে, 'আল্লাহ্ অ-সত্তার সাথে এক সঙ্গে অস্তিত্বশীল ছিলেন' এবং জগৎ পূর্বে অস্তিত্বশীল না থেকে পরে অস্তিত্বে এসেছে। বরং কুরআনের অনেকগুলো আয়াতের তাৎপর্য এটাই নির্দেশ করে যে, জগতের আকার বিশেষ সময়ে সৃষ্টি হয়েছে, পক্ষান্তরে এর স্থিতিকাল ও উপাদান অসৃষ্ট। যেমন 'তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর 'আরশ ছিল পানির ওপর' (কুরআন, ১১ : ৭)– এ আয়াতের দ্বারা পানি, আরশ এবং সময়–যা হল স্থিতিকালের পরিমাপক–এর অনাদিত্ব প্রমাণিত হয়। একইভাবে অন্যত্র উল্লেখ রয়েছে, 'অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ধুম্রপুঞ্জ বিশেষ' (কুরআন ৪১ : ১১)। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আকাশ পূর্বে অস্তিত্বশীল উপাদান 'ধুম্র' দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে।[৪৩] এখানে সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যাচ্ছে যে, ইবনে রুশ্‌দ পূর্ববর্তী দার্শনিকদের ন্যায় জগতের অনাদিত্বে বিশ্বাসী।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে মুসলিম দর্শনে অনাদিত্ব বিষয়ক বিতর্কের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। এটা সবাই স্বীকার করেন যে, আল্লাহ্ হলেন অনাদি সত্তা। কিন্তু তিনিই একমাত্র অনাদি সত্তা কিনা এ নিয়েই বিতর্কের সূত্রপাত। আলোচনায় দেখা গিয়েছে আল্লাহ্‌র গুণাবলিকে স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল অনাদি সত্তা হিসাবে গ্রহণ করলে নানাবিধ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং ইসলামের মর্মবাণী তাওহীদের সাথে এ মতটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচনা করা সম্ভব হয় না। একইভাবে কুরআনের নিত্যতা নিয়েও ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। আল্লাহ্‌র বাণী হিসাবে এর একটি চিরন্তন আবেদন রয়েছে, কিন্তু যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে কুরআনকে আল্লাহ্‌র সমান্তরাল একটি অনাদি সত্তা হিসাবে প্রমাণের প্রচেষ্টা যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে নানাবিধ জটিলতার জন্ম দেয়। মুসলিম-দর্শনে জগতের অনাদিত্ব বিষয়ক বিতর্কটির সূত্রপাত ঘটে মূলত অ্যারিস্টটলীয় দর্শনের প্রভাবের ফলে। অ্যারিস্টটলের দর্শনের সাথে সৃষ্টি বিষয়ক ইসলামি চিন্তাধারার সমন্বয় করার জন্য এ বিষয়ে এত আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়েছে। ইসলামে আল্লাহ্‌কে যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, অনুপম সত্তা হিসাবে বিশ্বাস করা হয় তা অ্যারিস্টটলীয় দর্শনে অনুপস্থিত। অতএব, অ্যারিস্টটলীয় ভাবধারাকে সমুন্নত রেখে জগৎ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান বিশুদ্ধ ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

তথ্যসূত্র :

১. Majid Fakhry, A History of Muslim Philosophy, Second edition, London: Longman, 1983; New York: Columbia University Press, 1983. p. 47

২. M.M Sharif, ed., A History of Muslim Philosophy, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1963, Vol. one, p. 200

৩. M. al-Shahrastani, Al-Milal Wa'l-Nihal, London, 1892, p. 30, Majid, Fakhry, op.cit., p. 57

৪. Abul Hasan al-Ash'ari, Maqalat al-Islamiyin, Istanbul; 1939-40, pp.156-57, দেখুন : Majid Fakhry, op.cit., p. 57; also see A.J.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Wensinck, The Muslim Creed. 2nd impression, London: Frank Cass & Co. Ltd. 1965, pp. 73-74, cf. Abu Mansur Abd-al-Qahir ibn-Tahir al-Baghdadi (d.1037) Al-Farq Bain al-Firaq English translation, Moslem Schisms and Sects, New York: Columbia University Press, 1920, p. 116 (Hereinafter the English translation of this book will be cited as reference)

৫. দেখুন, Al-Shahrastai, op.cit. p. 30, Wensinck, op.cit. p.75

৬. Wensink, op. cit. p.75

৭. দেখুন : বাগদাদের প্রধান বিচারপতির কাছে লেখা খলিফা আল-মামুনের পত্র, উদ্ধৃত : আল্- তাবারী, তারীখ, কায়রো, ১৯৩৯, ৭ম খণ্ড, পৃ ১৯৮; ইবনে আল্-নাদীম, কিতাব আল-ফিহ্রিস্ত, কায়রো (সন উল্লেখ নেই). পৃ. ২৬৯-৭০; Fakhry, op. cit. p. 61

৮. Al-Baghdadi, Usul al-Din, Istanbul, 1928, p.106; al-Ashari, op. cit. p. 598; al-Shahrastani, op. cit., p. 34; Fakhry, op. cit., p. 61-62; T.J. De Boer, The History of Philosophy in Islam, Eng. tr. Edward R. Jones, Delhi, Cosmo Publications reprint. 1983 (first published in 1903) pp. 50-51

৯. Al-Ashari, op. cit., pp. 191, 588; Fakhry, op. cit., p. 62

১০. কুরআন, ৮৫ : ২১

১১. Al-Ashari, op. cit., p. 598; Fakhry, op. cit., p. 62

১২. A.H. Al-Khayyat, Kitab al-Intisar, Beirut; 1957, al-Ashari, op. cit., pp. 582, 589, Fakhry, op. cit., p. 62

১৩. W.M. Patton, Ahmad b. Hambal and the Minha, Leyden, 1897, pp. 33ff. 50ff; Fakhry, op. cit., p. 63; দেখুন : Saiyed Abdul Hai, Muslim Philosophy, 2nd ed. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1982, pp. 114-115

১৪. দেখুন : Fakhry, op. cit., p. 63; Patton, op. cit., p. 139ff

১৫. দেখুন : R.J. McCarthy, The Theology of al-Ash‘ari. Beirut, 1953, p.9: Fakhry, op. cit., p. 206

১৬. Sharif. op. cit., p. 226; Fakhry, op. cit, p. 205

১৭. Sharif, op. cit., p. 227

১৮. Al-Ashari, Kitab al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah, Hyderabad, 1903, p. 47; Sharif, op. cit., p. 227

১৯. Sharif, op. cit., p. 227

২০. Al-Ashari, al-Maqalat, p. 291; Sharif, p. 227

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২১. Fakhry, op. cit., p. 206-7; al-Ashari, al-Ibanah, p. 54

২২. Abu al-Ala, Sharh-i Mawaqif, Lucknow; Newal Kishore (N.D.), p. 571; Sharif, op. cit., pp. 227-8

২৩. Sharif, op. cit., pp. 228-9, al-Ashari, al-Maqalat, p. 484

২৪. Sharif, op. cit., p. 232

২৫. Kitab al-Asma' wa-al-Sifat, p. 198; Sharif, op. cit., p. 233

২৬. Qadi 'Add and Sayyid Sharif, Sharh al-Mawaqif, (N.P., N.D) p. 601

২৭. Ibid., p.602; Al-Ashari, al-Ibanah, pp. 23-42, Sharif, op. cit., p. 233

২৮. Al-Ashari, al-Maqalat, pp. 292, 582-602; Sharif, op. cit., pp. 233-34

২৯. দেখুন : Simon Van Den Bergh, English translation of Ibn Rushd's Tahafut al-Tahafut, London: Luzac & Co. 1954, translator's Introduction, pp. XV-XVII, আবদুল জলিল মিয়া অনূদিত, অ্যারিস্টটলের অধিবিদ্যা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ. ৩২৫, ৩৩১, ৩৩৪

৩০. Al-Ghazali, Tahafut al-Falasifa, Eng. tr. Sabih Ahmad Kamali, (Incoherence of the Philosophers), Lahore: Pakistan Philosophical Congress, 1963, p. 14

৩১. Ibid., p. 15

৩২. Loc. cit.

৩৩. Ibid., pp. 15-16

৩৪. Ibid., p. 16

৩৫. Ibid., p. 32

৩৬. Ibid., pp. 35-36

৩৭. Ibid., p. 36

৩৮. Ibid., pp. 36-37

৩৯. Ibid., pp. 45-46

৪০. Ibid., p. 47

৪১. Ibid., pp. 48-49

৪২. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন : Ibn Rushd. Tahafut al-Falasifah, Eng. tr. pp. 1-69

৪৩. Ibn Rushd. Fasl al-Maqal, Cairo, N.D. p. 13, দেখুন : Fakhry, op. cit., p. 282

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইতিহাস ও মানবিক ক্রমবিকাশ

শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মোর্তাজা মোতাহ্হারী

অনুবাদ : নূর হোসেন মজিদী

আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইতিহাসে ক্রমবিকাশধারা, বা অন্য কথায়, মানুষের সামাজিক ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতি ।

বিজ্ঞানমনস্ক লোকেরা দুই ধরনের ক্রমবিকাশের ধারণা পোষণ করেন । এর মধ্যে একটি হচ্ছে জৈবিক ক্রমবিকাশ– যে সম্পর্কে আপনারা জীব বিজ্ঞানে পড়ে থাকতে পারেন এবং জেনে থাকবেন যে, মানুষকে সবচেয়ে উন্নত প্রাণী এবং প্রাণীজগতের ক্রমবিকাশধারার সর্বশেষ সংস্করণ হিসাবে গণ্য করা হয় ।

জৈবিক ক্রমবিকাশের তাৎপর্য অত্যন্ত স্পষ্ট । এটা হচ্ছে এমন একটি ক্রমবিকাশ মানুষের কোনরূপ হস্তক্ষেপ ছাড়াই এবং তাকে জিজ্ঞাসা না করেই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া নিজেই যা সম্পাদন করেছে । এ ব্যাপারে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । কারণ, একটি প্রাকৃতিক ও অনিবার্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিটি প্রাণীই ক্রমবিকাশের একটি স্তরে উপনীত হয়েছে । সেই একই প্রক্রিয়া মানুষকে এমন একটি স্তরে নিয়ে এসেছে যে কারণে আমরা তাকে 'মানবিক সত্তাবিশিষ্ট প্রাণী' বা 'মানুষ' বলে অভিহিত করে থাকি এবং তাকে অন্যান্য প্রজাতি থেকে স্বতন্ত্র ধরনের ও একটি বিশিষ্ট প্রকারের প্রজাতি হিসাবে গণ্য করি ।

কিন্তু ঐতিহাসিক ও সামাজিক ক্রমবিকাশ মানে একটি নতুন ধরনের ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া । প্রকৃতি মানুষের জৈবিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করে থাকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তার ঐতিহাসিক ও সামাজিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে প্রকৃতি সে ভূমিকা পালন করে না। এ ক্রমবিকাশ হচ্ছে একটি অর্জিত ক্রমবিকাশ অর্থাৎ এমন একটি ক্রমবিকাশ স্বয়ং মানুষ তার নিজের চেষ্টা-সাধনার দ্বারা যা অর্জন করেছে এবং যুগে যুগে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যা পরবর্তী প্রজন্মসমূহের মধ্যে স্থানান্তরিত করেছে, সহজাত উত্তরাধিকার হিসাবে নয়।

মানুষের জৈবিক ক্রমবিকাশ ঘটেছে মানুষের নিজের ইচ্ছা, উদ্যোগ ও চেষ্টাসাধনা ছাড়াই এবং সহজাত উত্তরাধিকার-বিধির আওতায় তা অর্জিত হয়েছে। কিন্তু মানুষের নিজের চেষ্টাসাধনার বদৌলতে অর্জিত সামাজিক ও ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সহজাত উত্তরাধিকার বিধির আওতায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত হয়নি। এমনকি এ ধরনের একটি ঘটনা সংঘটিত হবারও সম্ভাবনা নেই; বরং এটা শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি, বিশেষ করে লিখনরূপ শিল্পের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা কলমের এবং লেখার হাতিয়ারের[১] শপথ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলে আকরাম (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন :

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ إِقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَامُ الَّذِيْ عَلَّمَ بَالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

'(হে রাসূল!) আপনি পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে (মাতৃগর্ভে) আটকে থাকা বস্তু থেকে। আপনি পড়ুন, আর আপনার রব পরম মহিমাময় যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন; তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন তা যা সে জানত না।'[২]

এ আয়াতসমূহ থেকে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে কলম ব্যবহারের কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি মানুষকে তার ঐতিহাসিক ও সামাজিক ক্রমবিকাশ-ধারায় অগ্রগতি সাধনের ক্ষমতা দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মানব সমাজ তার সূচনাকাল থেকে অর্থাৎ সর্বপ্রথম যখন সভ্যতার উৎপত্তি হয় তখন থেকে অব্যাহতভাবে অগ্রগতি লাভ করেছে ও বিকশিত হয়েছে। আমরা জানি যে, জৈবিক ক্রমবিকাশের ন্যায় সামাজিক ক্রমবিকাশও একটি ক্রমায়াত প্রক্রিয়া। তবে এ ক্ষেত্রে একটি পার্থক্য রয়েছে, তা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হচ্ছে, কালের প্রবাহের সাথে সাথে তার ক্রমবিকাশের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য কথায়, তার ক্রমবিকাশ একটি ক্রমদ্রুতি প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে। এটা কেবল এগিয়েই চলেছে এবং মোটেই যাত্রাবিরতি করছে না, আর তার গতিও একটি সুনির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। ধরুন, একটি গাড়ি নির্দিষ্ট একশ' কিলোমিটার গতিতে পথ চলতে পারে, কিন্তু ক্রমদ্রুতি প্রক্রিয়া মানে হচ্ছে এর গতির ক্রমবৃদ্ধি– যে ক্ষেত্রে প্রতি মিনিটেই তার গতি পূর্ববর্তী মিনিটের চেয়ে বৃদ্ধি পায়।

যদিও ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতিকে একটি অনিবার্য বিষয় বলে মনে হয়, তথাপি আপনারা জেনে বিস্মিত হবেন যে, এমন জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ আছেন যাঁরা যা কিছু ঘটেছে তাকে অগ্রগতি বা ক্রমবিকাশ বলা উচিত কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছেন। এ ব্যাপার আদৌ সন্দেহ করার কোন অবকাশ আছে কিনা ভেবে কেউ কেউ বিস্মিত হতে পারেন। তবে যে সব জ্ঞানী ব্যক্তি এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন তাঁদের সে সন্দেহের পিছনে কারণ ও যুক্তি আছে; এ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করছি।

এখানে আমরা কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করছি যে, যদিও আমরা তাঁদের সন্দেহকে যথার্থ বলে মনে করি না এবং আমরা মনে করি যে, মানব সমাজ অব্যাহতভাবে তার সর্বাত্মক ক্রমবিকাশের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং তার চূড়ান্ত লক্ষ্য অভিমুখে তার অভিযাত্রা অব্যাহত রয়েছে, তবে সে সাথে আমরা তাঁদের সন্দেহকে একেবারে অমূলক মনে করি না। এতদসত্ত্বেও আমরা ক্রমবিকাশের তাৎপর্যকে পুরাপুরি অনুধাবন করার উদ্দেশ্যে তাঁদের এ সন্দেহের কারণগুলো ব্যাখ্যা করব।

ক্রমবিকাশ কী?

আমাদের জন্য প্রথমে 'ক্রমবিকাশ'কে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। বস্তুত কতক বিষয় প্রথমেই এমন সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, সেগুলোর কোন সংজ্ঞা দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু কেউ যখন সেগুলোকে সংজ্ঞায়িত করতে চায় তখন দেখতে পায় যে, বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন এবং এ ক্ষেত্রে সে বহু সমস্যার সম্মুখীন। ক্রমবিকাশ সম্পর্কে দার্শনিকগণ যে সব সংজ্ঞা দিয়েছেন আমি তার সবগুলো এখানে উদ্ধৃত করতে চাই না।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইসলামী দর্শনে একটি চমৎকার আলোচ্য বিষয় আছে যে সম্পর্কে কুরআন মজীদের দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তি উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিষয়টি হচ্ছে 'সম্পূর্ণ' ও পূর্ণ'-এর মধ্যকার পার্থক্য। আমরা 'সম্পূর্ণ' শব্দটিকে 'অসম্পূর্ণ'-এর বিপরীতে ব্যবহার করে থাকি, আবার 'পূর্ণ' শব্দটিকেও 'অসম্পূর্ণ'-এর বিপরীতে ব্যবহার করে থাকি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'সম্পূর্ণ' মানে কি 'পূর্ণ'? কুরআন মজীদের একটি আয়াতে এ দু'টি পরিভাষা পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে যা ইমামত ও বেলায়াতের প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন :

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

'(হে ঈমানদারগণ!) আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার নে'আমতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করে দিলাম।'[৩]

এ আয়াতে দেখা যাচ্ছে, কুরআন মজীদ 'পূর্ণতা' (ইক্মাল্) ও 'সম্পূর্ণতা' (ইত্মাম্)-কে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছে। নে'আমতকে একটি 'অসম্পূর্ণ' অবস্থা থেকে 'সম্পূর্ণ' করে দেওয়া হয়েছে এবং দীনকে একটি 'অসম্পূর্ণ' অবস্থা থেকে 'পূর্ণ' করে দেওয়া হয়েছে। তবে এ দু'টি পরিভাষার তাৎপর্যের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনার আগে আমি 'ক্রমবিকাশ' ও 'অগ্রগতি'র মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই; এরপর পুনরায় 'সম্পূর্ণ' ও 'পূর্ণ'-এর মধ্যকার পার্থক্য সংক্রান্ত আলোচনায় ফিরে আসব।

প্রশ্ন হচ্ছে, 'ক্রমবিকাশ' ও 'অগ্রগতি' কি অভিন্ন? দু'টি পরিভাষার তাৎপর্যের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে যা উভয়ের ব্যবহার থেকেই আপনাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়তে বাধ্য।

আমরা অনেক সময় কোন অসুস্থতা সম্পর্কে কথা বলি যাতে অগ্রগতি হচ্ছে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমরা বলি না যে, বিকাশ হচ্ছে। কোন সেনাবাহিনী যদি কোন ভূখণ্ডের জন্য যুদ্ধ করে এবং সে যুদ্ধে ঐ ভূখণ্ডের অংশবিশেষ দখল করতে সক্ষম হয় তাহলে আমরা বলি যে, সেনাবাহিনী অগ্রসর হচ্ছে বা যুদ্ধে তাদের অগ্রগতি হচ্ছে, কিন্তু আমরা বলি না যে, সেনাবাহিনী বিকাশ লাভ করছে। এর কারণ কী? কারণ, 'বিকাশ' বা 'ক্রমবিকাশ'-এর মধ্যে একটি উচ্চতর বা মহিমান্বিত অবস্থার ভাবধারা নিহিত

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রয়েছে। কারণ, 'বিকাশ' বা 'ক্রমবিকাশ' হচ্ছে গুণগত দিক থেকে ঊর্ধ্বমুখী অগ্রযাত্রা–গুণগত নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর স্তরের দিকে অগ্রগমন। কিন্তু অগ্রগতি বা অগ্রসরতা সব সময়ই আনুভূমিক স্তরে হয়ে থাকে।

একটি সেনাবাহিনী যখন কোন ভূখণ্ড দখল করে নেয় এবং আগে থেকেই যে ভূখণ্ড তার নিয়ন্ত্রণে ছিল তার সাথে এ ভূখণ্ডটি যোগ করে নেয় তখন আমরা বলি যে, সেনাবাহিনীটি অগ্রগমন করেছে বা এগিয়ে গেছে। এর মানে হচ্ছে, সেনাবাহিনীটি সামনের দিকে গতিশীল হয়েছে, তবে সে আগে যে সমতলে ছিল সে সমতলেই। এ ক্ষেত্রে কেন আমরা বলি না যে, সেনাবাহিনীটি বিকাশলাভ করেছে? কারণ, 'ক্রমবিকাশ'-এর ধারণার মধ্যে এক ধরনের মহিমান্বিত অবস্থার তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। সুতরাং আমরা যখন সামাজিক ক্রমবিকাশের কথা বলি তখন তা থেকে মানুষের মহিমান্বিত অবস্থার কথা বুঝিয়ে থাকি, কেবল তার অগ্রগতি ও অগ্রসরতা নয়।

মানব সমাজের গুণগত বিকাশ ও মহিমান্বিত অবস্থা ছাড়াও অনেক কিছুকে মানুষ ও সমাজের অগ্রগতি হিসাবে গণ্য করা চলে। আমরা এ উদ্দেশ্যে এ বিষয়টি উল্লেখ করলাম যে, কিছু সংখ্যক মনীষী যে এ ধরনের অগ্রগতিকে বিকাশ বলা উচিত কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তাঁদের সে সন্দেহ একেবারে অমূলক নয়। যদিও আমরা এ ব্যাপারে তাঁদের সাথে একমত নই তথাপি তাঁরা যা বলেছেন তা অন্তঃসারশূন্য কথা নয়। অতএব, এটা অনস্বীকার্য যে, ক্রমবিকাশ এবং 'অগ্রগতি ও উন্নয়ন'-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। (অগ্রগতি ও উন্নতির তাৎপর্য প্রায় অভিন্ন।)

এ একই পন্থায় 'পূর্ণ' ও 'সম্পূর্ণ'র মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবন করা যেতে পারে। কোন কিছু যখন কয়েকটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত হয়, যেমন একটি ভবন বা একটি গাড়ি, তাতে যতক্ষণ তার সকল অংশ না থাকে ততক্ষণ আমরা তাকে অসম্পূর্ণ বলি। আর যখন তাতে তার সর্বশেষ প্রয়োজনীয় অংশটি যুক্ত করা হয় তখন আমরা সেটিকে 'সম্পূর্ণ' বলি। কোন শিশু যখন তার কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তখন আমরা তাকে 'ত্রুটিপূর্ণ' বা 'অসম্পূর্ণ' বলি, কিন্তু শিশুটি যদি তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহকারেও জন্মগ্রহণ করে তথাপি তাকে আমরা ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে 'অসম্পূর্ণ' বলতে পারি। কারণ, তাকে অনেক কিছু শিখতে হবে এবং শেখার ও শিক্ষাগ্রহণের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে যেতে হবে–যা তার জন্য এক ধরনের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মহিমান্বিত অবস্থা নিয়ে আসবে এবং তা তার জন্য বিকাশের বিভিন্ন স্তর হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

আমরা জৈবিক ও সামাজিক ক্রমবিকাশ বা বিকাশের সংজ্ঞা সংক্রান্ত আলোচনা এখানেই শেষ করছি। এরপর এ প্রসঙ্গে অপর কতকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এ ব্যাপারে আমরা যে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বেছে নিয়েছি তা হচ্ছে :

১. মানবজাতি তার গোটা ইতিহাসে, তার সামাজিক জীবনে বিকাশের ও মহিমান্বিত অবস্থার অধিকারী হয়েছে কি?

২. মানবসমাজ কি এখনও বিকাশের প্রক্রিয়ায় রয়েছে এবং ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ বিকাশের অধিকারী হবে কি?

৩. মানবসমাজ যদি বিকাশের প্রক্রিয়াধীনে থেকে থাকে তাহলে আদর্শ সমাজ–প্লেটো যাকে কাল্পনিক আদর্শ মানুষের সমাজ বলেছেন–কোন্‌টি? এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ কী কী?

আমরা মানবজাতির ইতিহাসকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বুঝতে পারি, কিন্তু ভবিষ্যতের বিষয়টি কীরূপ? আমরা কি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চোখ বন্ধ করে রাখব এবং বলব যে, ইতিহাস অনিবার্যভাবেই এক বিকাশপথে অগ্রসর হবে? প্রকৃতিতে বিকাশ কি সময়ের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া বিষয়? সময়ের জাহাযটি কি মানুষের সামান্যতম হস্তক্ষেপ ছাড়াই এবং তার কোন রকম দায়দায়িত্ব ও করণীয় ছাড়াই ক্রবিকাশের অলঙ্ঘনীয় পথে এগিয়ে চলেছে? মুক্ত ইচ্ছা, নির্বাচনের স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতার অধিকারী প্রাণশীল অস্তিত্ব হিসাবে মানুষ কি অতীতে কোন ভূমিকাই পালন করেনি? অতীতে মানুষ যে ভূমিকা পালন করেছে তা কি গৌণ ভূমিকা ছিল এবং সে কি অলঙ্ঘনীয়ভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া ভূমিকা পালন করেছে, নাকি অতীতে কেউ তার জন্য অলঙ্ঘনীয়ভাবে কোন ভূমিকা নির্ধারণ করে দেয়নি?

বস্তুত মানুষ নিজেরাই তাদের মুক্ত ইচ্ছা, নির্বাচন এবং স্বীয় উদ্যোগ ও সমাজ পরিকল্পনার দ্বারা তাদের সমাজের জন্য ক্রমবিকাশর পথ নির্ধারণ করেছে এবং তাকে এগিয়ে নিয়েছে। অতীতে মানুষের যে মুক্ত ইচ্ছা ও স্বাধীনতা ছিল এ সত্যটি ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। অতএব, একদল মানুষ অবশ্যই প্রশংসা ও ভালবাসা পাবার উপযুক্ত। তাঁরা হচ্ছেন সে সব লোক যাঁদের পক্ষে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের বিরুদ্ধে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দাঁড়াবার পথ বেছে নেওয়া বা সে ক্রমবিকাশকে স্বীয় সমর্থন ও সহায়তা থেকে বঞ্চিত করা এবং স্বীয় ব্যক্তিগত উন্নতি-অগ্রগতি ও কল্যাণের জন্য সংগ্রাম করার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা মুক্তভাবে ও স্বীয় স্বাধীনতার দ্বারা সামাজিক ক্রমবিকাশের পথ অনুসরণকে বেছে নিয়েছিলেন এবং এজন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। একইভাবে অপর একদল লোককে নিন্দা করা ও ধিক্কার দেওয়া, বরং অভিশাপ দেওয়া প্রয়োজন যারা এ সামাজিক ক্রমবিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।

আমরা যদি ভবিষ্যতকে চিনতে না পারি এবং এর জন্য আমাদের কোন পরিকল্পনা না থাকে, আমরা যদি ইতিহাস বিনির্মাণের দিকে মনোযোগ না দেই তাহলে আমরাও ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহের কাছ থেকে নিন্দা ও ধিক্কার লাভের উপযুক্ত। বস্তুত ইতিহাস মানুষেরই তৈরি, মানুষ ইতিহাসের তৈরি নয়। আমাদের যদি ভবিষ্যতের জন্য কোন পরিকল্পনা না থাকে এবং আমরা যদি ইতিহাসের ভবিষ্যতের জন্য আমাদের দায়িত্ব অনুভব না করি তাহলে কেউই এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে না যে, এ জাহায স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাবে। নিদেন পক্ষে বলা যেতে পারে যে, এ জাহাযটি হয় এগিয়ে যাবে নয়ত পিছন দিকে পিছিয়ে আসবে। এভাবে ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এগিয়ে যাওয়া বা পিছিয়ে আসার সক্ষমতা এ ধারণারই সত্যতা প্রমাণ করে যে, ঘটনাবলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামনে এগিয়ে নেয় এমন কোন অন্ধ জবরদস্তি শক্তির অস্তিত্ব নেই। এটা এমন একটি বিষয় যাকে ইসলামে, বিশেষ করে শিয়া মাযহাবের চৈন্তিক অঙ্গনে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের অন্যতম সমুন্নত শিক্ষা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। (এ ব্যাপারে আমি আমার 'মানুষ ও নিয়তি'[৪] পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।)

বাদা' প্রসঙ্গ

ইসলামের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বাদা'[৫] (পূর্ব বিষয় রহিত করে নতুন বিষয় চালু করা)। বাদা'-র একটি বাহ্যিক তাৎপর্য রয়েছে যাকে খুব কম লোকের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা সম্ভব। এমনকি শিয়া মাযহাবের অনুসারীরা বাদা'-য় বিশ্বাস করে বলে অনেকে শিয়াদের সমালোচনা করেছেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বাদা' কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে খোদায়ী ফয়সালায় (ক্বাযা') পরিবর্তন সংঘটিত হওয়া। এর অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ্ তা'আলা মানবিক ইতিহাসের গতিধারার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট পথ বেঁধে দেননি। অন্য কথায়, আল্লাহ্ তা'আলা যেন মানুষকে বলছেন : 'তোমরা নিজেরাই ঐশী নিয়তি পূর্ণ করার জন্য দায়িত্বশীল এবং তোমরাই ইতিহাসের গতিধারাকে এগিয়ে নিতে পার, থামিয়ে দিতে পার বা বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিতে পার।' প্রকৃতির ক্ষেত্রে বা মানুষের জীবনে অথবা ঐশী পন্থা নির্ধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে এমন কোন অন্ধ নিয়তি নেই যা ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটা হচ্ছে মানুষ, ইতিহাস ও ভাগ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করার একটি পথ।

অতএব, যতক্ষণ না আমরা ক্রমবিকাশের সম্মুখপথের সাথে এবং মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্যের সাথে পরিচিত হব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ক্রমবিকাশ সম্পর্কে কথা বলতে পারি না। সে ক্ষেত্রে আমরা কেবল এতটুকুই বলতে পারি যে, মানুষ এগিয়ে চলেছে। সে ক্ষেত্রে সাথে সাথেই এ প্রশ্নটি আসে যে, সে কোন্‌দিকে এবং কোন্ লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে চলছে? আমরা যদি এ প্রশ্নের জবাব দিতে না পারি তাহলে আমাদের কী অধিকার আছে ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কথা বলার? আমরা কি ভবিষ্যতের জন্য একটি পথ খুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ইতিহাস অধ্যয়ন করি না? ইতিহাস অধ্যয়ন করে যদি আমরা কেবল এতটুকু ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হই যে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন পথ দেখানো ছাড়াই ইতিহাস আমাদের তার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ দিচ্ছে তাহলে এ ইতিহাসের প্রয়োজন কী? এটা কী কাজে লাগল?

কিন্তু আমরা কুরআন মজীদে দেখতে পাই যে, এ ঐশী গ্রন্থ ইতিহাসকে এমনভাবে পর্যালোচনা করেছে যে, তা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য পথ দেখাচ্ছে এবং আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, ভবিষ্যৎ কেমন হওয়া উচিত। সুতরাং আমাদের আলোচ্য বিষয় অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এবং এরপর তা ভবিষ্যতের সাথে সংশ্লিষ্ট। আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণের প্রশ্ন কেবল তখনি আসে যখন আমরা অতীতের সাথে পরিচিত হবার পর ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও একটি ধারণার অধিকারী হতে পারি।

অতীতে ইতিহাসের ক্রমবিকাশ

আমরা যদি ইতিহাসকে দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করি তাহলে মানুষ বিকাশের অধিকারী না হয়ে থাকলেও সন্দেহাতীতভাবেই অগ্রগতি হাসিল করেছে। এর একটি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হচ্ছে যান্ত্রিক উন্নতি ও মানব জীবনে যন্ত্রপাতির ব্যবহার। নিঃসন্দেহে মানুষ যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষেত্রে উন্নতি হাসিল করেছে এবং অবশ্যই সে উন্নতি চোখ ধাঁধানো বিস্ময়কর উন্নতি। মানুষ এক সময় অমসৃণ পাথর জমা করত, পরবর্তীকালে সে মসৃণ ও পালিশ করা পাথর জমা করতে থাকে। আর এখন সে প্রযুক্তি, কারিগরি বিদ্যা ও শিল্পের ক্ষেত্রে বর্তমান উন্নত স্তরে উন্নীত হয়েছে। মানুষ কেবল কারিগরি নৈপুণ্যই হাসিল করেনি এবং কেবল যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ক্ষেত্রেই অগ্রগতির অধিকারী হয়নি; বরং সে এমনই বিপুল ও বিস্ময়কর অগ্রগতি হাসিল করেছে যে, দুই বা একশ' বছর আগে আমাদের পূর্বসূরি ও দার্শনিকগণ যদি বলতেন যে, মানুষ একশ' বা দু'শ' বছর পরে এ ধরনের উন্নতি করবে (বর্তমানে যে ধরনের উন্নতি করেছে) তাহলে কেউই তাঁদের কথা বিশ্বাস করত না।

একে আপনি 'অগ্রগতি' বা 'বিকাশ' যা খুশী বলতে পারেন, কিন্তু এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই যে, মানুষ যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষেত্রে দারুণ ও বিস্ময়কর অগ্রগতি হাসিল করেছে। আর এ অগ্রগতির অভিযাত্রা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়, যদি না কোন ঐতিহাসিক বিপর্যয় বা বড় ধরনের দুর্যোগ তার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে–যে সম্পর্কে কিছু সংখ্যক মনীষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাঁদের মতে, এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে, মানুষের শিল্প ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এমন একটি স্তরে উপনীত হবে যে, সে নিজেকে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তার সকল অর্জন, তার বই-পুস্তকাদি, তার জ্ঞান ও সভ্যতাকে এবং এ সবের সকল চিহ্ন ও নিদর্শনকে ধ্বংস করে ফেলবে। এরপর এ পৃথিবীর বুকে এক নতুন ধরনের মানুষ জীবন যাপন করতে শুরু করবে এমন সম্ভাবনা রয়েছে। এ ধরনের বিপর্যয় সংঘটিত না হলে নিঃসন্দেহে যান্ত্রিক উন্নতি এমন এক পর্যায়ে উপনীত হবে যা আজ কল্পনাও করা যায় না।

এ উন্নতি হচ্ছে মানুষের অভিজ্ঞতা ও তার জ্ঞানের উন্নতিরই ফসল। কারণ, মানুষ তার পরীক্ষামূলক জ্ঞান ও প্রকৃতি সংক্রান্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রে এতখানি উন্নতি সাধন করেছে যে, সে প্রকৃতিকে জয় করতে ও তাকে স্বীয় বাধ্যগত ভৃত্যে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে।

এ হল মানবিক উন্নতি ও অগ্রগতির একটি দিক।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মানুষের বিকাশের (যাকে অবশ্য 'বিকাশ' নামে অভিহিত করা খুবই কঠিন) আরেকটি দিক হচ্ছে তার সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্র ও তার সমাজ কাঠামোতে (এখানে 'সম্পর্ক' বলত মানবিক সম্পর্ক বুঝান হচ্ছে না) পরিবর্তন। মানব সমাজে ধীরে ধীরে রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে। অতীতে মানব সমাজের যে সহজ-সরল কাঠামো ছিল তার পরিবর্তে জটিল ধরনের কাঠামোর উদ্ভব ঘটেছে। অন্য কথায়, শিল্প ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে সে যেভাবে গতকালের সাদামাটা ধরনের গাড়ি থেকে আজকের দিনের বিমান ও অত্যাধুনিক মহাশূন্য যানের পর্যায়ে অগ্রগতি সাধন করেছে ঠিক একইভাবে তার সমাজ একটি জটিল সমাজে পরিণত হয়েছে। একে প্রাকৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এক কোষবিশিষ্ট জীবের সহজ-সরল কাঠামোর বিপরীতে মানবদেহের মত অত্যন্ত জটিল শারীরিক কাঠামোর সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

অনেকে ক্রমবিকাশকে দু'টি স্তরবিশিষ্ট একটি প্রক্রিয়া হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। প্রথম পর্যায় হচ্ছে আকর্ষণ বা একত্রকরণ এবং বিভাজনের মাধ্যমে অংশসমূহের বহুত্বকরণ। একে এককত্ব বা একমুখিতা থেকে বহুমুখিতা অভিমুখে অভিযাত্রা নামে অভিহিত করা যেতে পারে। অন্য কথায়, একটি একক সম্পর্কের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশকে বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পরস্পর সংযুক্তকরণের মাধ্যমে একটি নতুন ও জটিল এককের উদ্ভব হওয়া। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা জানি যে, ভ্রূণ সঞ্চারের প্রক্রিয়া হচ্ছে, প্রথমে পুরুষের একটি শুক্র কীট ও নারীর একটি ডিম্ব একত্র হয়ে একটি সহজ-সরল সাধারণ কোষ তৈরি হয়। এরপর এটিতে বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হয় অর্থাৎ তা তার পারিপার্শ্বিকতা থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদান আকর্ষণ করে পরিপুষ্টি ও পরিবৃদ্ধি হাসিলের পর বিভাজিত হয়; প্রথমে সেই একক কোষটি বিভাজিত হয়ে দু'টিতে পরিণত হয়, এরপর দু'টি কোষ চারটিতে, চারটি আটটিতে ও আটটি ষোলটিতে পরিণত হয় এবং এভাবে চলতে থাকে। কিন্তু এটা হচ্ছে কেবল সংখ্যাগত দিক থেকে বৃদ্ধির প্রক্রিয়া। অতঃপর একটি স্তরে গিয়ে তাতে অন্য এক ধরনের বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এ পর্যায়ে একটি অংশ স্নায়ুমণ্ডলিতে পরিণত হয়, অন্য একটি অংশ হৃদপিণ্ডে পরিণত হয়, আর কতক কোষ রক্তে পরিণত হয় এবং গোটা শরীরে রক্তপ্রবাহের একটি প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে। আর সবগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরস্পর সংযুক্ত ও সক্রিয় থেকে একটি মানব দেহ গঠন করে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মানবসমাজও একইভাবে অগ্রগতি হাসিল করেছে, তা আপনারা একে বিকাশ নামে অভিহিত করুন বা না-ই করুন। অর্থাৎ মানবসমাজের কাঠামো একটি সহজ-সরল অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে একটি জটিল অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ের মানবসমাজ বা গোত্রীয় সমাজের কাঠামো ছিল খুবই সহজ-সরল। এ ধরনের সমাজ কাঠামোতে অল্প কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে গঠিত একটি গোত্রে একজন গোত্রপতি থাকত। আর গোত্রপতি গোত্রের লোকদের মধ্যে সাধারণ বা সর্বজনীন কাজগুলো বণ্টন করে দিত এবং এ ধরনের কাজের সংখ্যাও ছিল খুবই কম। কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে এ ধরনের কর্মবিভাজন জটিল রূপ ধারণ করেছে। কারণ, বর্তমানে কাজের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে এবং কাজ করার মত লোকের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান কালের কাজকর্ম, চাকরি, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য পেশার বিভিন্ন ধরন ও প্রকরণের সাথে এমনকি একশ' বছর আগের এসব বিষয়ের তুলনা করলেও বিষয়টি আপনাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

এ ব্যাপারে আমরা প্রশাসনিক ও জ্ঞানগত পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও তার বিভিন্ন স্তরের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। অতীতে কোন ব্যক্তির পক্ষে স্বীয় যুগে বিদ্যমান সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করা সম্ভবপর ছিল। ফলে সে ব্যক্তির পক্ষে ইবনে সীনা বা অ্যারিস্টোটল হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক বেশি বিভাগ ও উপবিভাগের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের যুগে এখন অ্যারিস্টোটল ও ইবনে সীনার মত শত শত ব্যক্তি আছেন, তবে তাঁদের প্রত্যেকেই কেবল নিজ নিজ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ–যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার সাথে মোটেই পরিচিত নন; এমনকি তাঁরা বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক শাখা-প্রশাখার অস্তিত্ব সম্পর্কেও অবগত নন।

এ হচ্ছে আমাদের যুগের একটি বৈশিষ্ট্য। এটা এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা মানুষের মধ্য থেকে সমরূপতা ও সুসঙ্গতিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে এবং পার্থক্য ও বিশিষ্টতাকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছে। কারণ, মানুষ যেমন কাজ সৃষ্টি করে, তেমনি কাজও মানুষকে গড়ে তোলে। ফলত যদিও একটি সমাজে বসবাসকারী সকলেই মানুষ, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন তারা বিভিন্ন ধরনের প্রকৃতির অধিকারী। কারণ, প্রত্যেকেই এমন একেকটি কাজ করছে যে সম্পর্কে অন্য কাজে ব্যস্ত অপর ব্যক্তি কিছুই জানে না।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মনে হচ্ছে যেন তাদের প্রত্যেকেই একেকটি স্বতন্ত্র জগতের বাশিন্দা। এর ফল হচ্ছে এই যে, মানুষ পরস্পর থেকে ভিন্ন ধরনের হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা যদি সমাজ, সংগঠন, কর্মবিভাজন, দক্ষতা ও মেধা-প্রতিভা প্রসঙ্গে অগ্রগতি বা বিকাশের কথা বলতে চাই তাহলে বলতে হবে যে, মানবসমাজের কাঠামো একটি সহজ-সরল অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে একটি জটিল ও চরমভাবে পরস্পর বিজড়িত অবস্থা পরিগ্রহণ করেছে।

এ সব মন্তব্য থেকে নিঃসন্দেহে আপনারা অনুভব করতে পারছেন যে, সব কিছু যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে অনেক ধরনের পার্থক্যের উদ্ভবজনিত একটি বিপদ দেখা দেবে যার ফলে মানবজাতি হুমকির সম্মুখীন হবে। অর্থাৎ মানুষে মানুষে কেবল তাদের বাহ্যিক চেহারায় মিল ও সমরূপতা থাকবে, কিন্তু তাদের মানসিক, আধ্যাত্মিক, ভাবাবেগ ও শিক্ষাগত কাঠামো পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হবে; আর এটা হবে মানব জাতির জন্য একটা বিরাট বিপদ। এ কারণেই বলা হয় যে, প্রযুক্তিগত উন্নতি মানুষকে তার নিজের কাছেই অপরিচিত করে তুলেছে। এ বিষয়ের উন্নতি তাকে তার চাকরি ও পেশার জন্য প্রয়োজনীয় একটি প্রাণীরূপে গড়ে তুলেছে এবং তার মানবিক বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করে দিয়েছে। স্বয়ং এ অবস্থাই একটা বড় সমস্যা।

সে যা-ই হোক, আমরা বলতে পারি যে, সামাজিক কাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকেও সমাজ সমূহ অতীতে বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে। অবশ্য এখানে প্রকৃতির ওপর মানুষের ক্ষমতা ও আধিপত্য ছাড়াও এবং মানব সমাজ ও সামাজিক সংগঠনসমূহের কাঠামোর পাশাপাশি এমন আরও কতকগুলো সমস্যা আছে যা মানবিক প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত; আর তা হচ্ছে ব্যক্তি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক।

মানবিক সম্পর্কসমূহ

প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ যেভাবে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতি হাসিল করেছে সে কি মানুষে মানুষে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক ও সমাজকাঠামোর জটিলতার ক্ষেত্রে একইভাবে গুণগত দিক থেকে উন্নতি সাধন করেছে? সে যদি তা করে থাকে তাহলে আমরা একে বিকাশ বলে অভিহিত করতে পারি।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মানুষ কি পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করেছে? আজকের মানুষ কি অন্যদের প্রতি অতীতের মানুষের তুলনায় অধিকতর সহযোগিতার অনুভূতি পোষণ করে? অন্য মানুষের প্রতি দায়িত্ব অনুভব করার ক্ষেত্রে সে কি আনুপাতিক হারে অগ্রগতি হাসিল করেছে? মানুষের দ্বারা অন্য মানুষদের শোষণ কি আসলেই হ্রাস পেয়েছে? নাকি কেবল শোষণের ধরন পাল্টেছে এবং মাত্রাগত ও পরিমাণগত দিক থেকে শোষণ বৃদ্ধি পেয়েছে? অন্যদের অধিকারের বিরুদ্ধে মানুষের আগ্রাসন ও সীমালঙ্ঘন কি হ্রাস পেয়েছে? যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষেত্রে মানুষ যেভাবে উন্নতি করেছে এবং সামাজিক কাঠামোর জটিলতা যে মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে সে অনুপাতে কি মানুষের পরস্পরিক মানবিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি এ সব সমস্যা আগের মতই একই অবস্থায় রয়ে গেছে? নাকি কতক লোকের পক্ষে দাবি করা সম্ভব যে, এ ব্যাপারে যে শুধু উন্নতি সাধিত হয়নি শুধু তা-ই নয়; বরং এ ক্ষেত্রে মানুষ অনেক পিছিয়ে গেছে? অন্য কথায়, সাধারণভাবে কি এটা বলা যেতে পারে যে, মানবিক মূল্যবোধসমূহ এবং যা কিছু মানুষের মানবিকতার মানদণ্ড তা আনুপাতিক হারে অগ্রগতি লাভ করেছে?

এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক লোক বিশ্বনিন্দুকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন; মানুষ এ ক্ষেত্রে আদৌ কোন অগ্রগতি হাসিল করেছে–এ কথা তাঁরা অস্বীকার করে থাকেন। তাঁরা বলেন, উন্নতি-অগ্রগতির মানদণ্ড যদি হয়ে থাকে কল্যাণ ও সুখ-শান্তি, তাহলে আমাদের পক্ষে এ কথা বলা কঠিন যে, মানুষ উন্নতি করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এমনকি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রেও সন্দেহ আছে যে, তা মানুষের কল্যাণ সাধন করেছে কিনা। যে সব ক্ষেত্রে খুবই অগ্রগতি হাসিল হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছ গতি–যা টেলিফোন, বিমান ও এ জাতীয় অন্যান্য জিনিসের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মানবিক কল্যাণের মানদণ্ডে পরিমাপ করলে গতির এ উন্নতিকে কি অগ্রগতি বলা যেতে পারে নাকি, যেহেতু গতি হচ্ছে একটি মাধ্যম, সেহেতু তা এক হিসাবে যেমন মানুষকে আরাম দিয়েছে, অন্য অনেক কিছুর বিচারে তা মানুষকে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করেছে? কারণ, গতির এ উন্নতি একদিকে যেমন একজন ভাল মানুষকে দ্রুত তার লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়, ঠিক সেভাবেই তা একজন দুষ্ট লোককে তার লক্ষ্যের ও অসদুদ্দেশ্য সাধনের দিকে নিয়ে যায়। গতির এ উন্নতির ফলে একজন সুস্থ ও সৎ মানুষের হাত দু'টি অধিকতর শক্তিশালী ও তার পা দু'টি দ্রুততর হয়েছে। অন্যদিকে একজন দুষ্ট লোকও একই সুবিধা লাভ করেছে। মাধ্যমের এ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দ্রুততার ফলে একজন অপরাধীর পক্ষে হাজার হাজার, এমনকি লক্ষ লক্ষ মানুষকে একবারে হত্যা করার জন্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

তাহলে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত উপসংহার কী? যদিও আমি এ ধরনের বিশ্বনিন্দুক অভিমতের সমর্থক নই, তথাপি আমি এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে চাই যে, কেন কিছু সংখ্যক লোক এ ধরনের অভিমত ব্যক্ত করছেন। উদাহরণ স্বরূপ, ঔষধ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নতি কি প্রকৃত উন্নতি? দৃশ্যত তা-ই। কারণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একটি শিশু যখন ডিপথেরিয়ায় ভোগে তখন তার জন্য বর্তমানে যথাযথ ওষুধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা উন্নতি। কিন্তু অ্যালেক্সিস ক্যারলের মত কতিপয় লোক এ সব বিষয়কে মানবতার মানদণ্ডের দ্বারা পরিমাপ করেন। তাঁরা মনে করেন যে, ওষুধপত্র ক্রমান্বয়ে মানব প্রজাতিকে দুর্বলতর করে ফেলছে। তাঁরা বলেন, অতীতে মানুষের শরীরে রোগব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি ছিল। এ কারণে দুর্বল ধ্বংস হয়ে যেত ও সবল বেঁচে থাকত এবং এর ফলে পরবর্তী প্রজন্মসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও রোগ প্রতিরোধী হত। শুধু তা-ই নয়, এর ফলে অপ্রয়োজনীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধিও রোধ হত। কিন্তু বর্তমানে ওষুধপত্র কৃত্রিম পন্থায় দুর্বল লোকদেরকে টিকিয়ে রাখছে, নচেৎ তারা প্রকৃতির সিদ্ধান্তের ফলে প্রকৃতই মৃত্যুবরণ করত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। ফলে তাদের পরবর্তী প্রজন্মসমূহ আর টিকে থাকার উপযুক্ত নেই এবং এভাবে প্রতি পরবর্তী প্রজন্ম তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের তুলনায় দুর্বলতর হচ্ছে। মাতৃগর্ভে আগমনের পর সপ্তম মাসে জন্মগ্রহণকারী একটি শিশু প্রকৃতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করার কথা। কিন্তু বর্তমানে ওষুধপত্র ও চিকিৎসা উপকরণের উন্নতির ফলে এ সবের সাহায্যে তাকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে। কিন্তু এর ফলে পরবর্তী প্রজন্মের অবস্থা কী হবে? অধিকন্তু অতি-জনসংখ্যার প্রশ্নও আসে। এর ফলে যা ঘটছে তা হচ্ছে, মানবজাতির উন্নয়ন ও বিকাশের স্বার্থে যারা বেঁচে থাকার জন্য অধিকতর উপযুক্ত তাদেরও অনেকে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং যারা এ বিকাশে অবদান রাখতে সক্ষম নয় তাদের অনেকে কোন না কোনভাবে বেঁচে যাচ্ছে।

ওষুধ ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি মানুষের প্রকৃত উন্নতি কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণের এ-ও অন্যতম কারণ।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অন্য একটি দৃষ্টান্ত

প্রচারমাধ্যম প্রসঙ্গে কেউ মনে করতে পারেন যে, ঘরের কোণে বসে তাঁর আগ্রহের কোন বিষয়ের সংবাদ সাথে সাথে শুনতে পারা একটা চমৎকার ব্যাপার। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, একই বিষয় মানুষের জন্য যথেষ্ট উদ্বেগ ও ভীতির সৃষ্টি করছে। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে মানুষের জন্য এ ধরনের সংবাদ না শোনাই কল্যাণকর। উদাহরণস্বরূপ, অতীতে যে সব লোক শীরাযে[৬] বসবাস করত তারা গূচানে[৭] সংঘটিত প্লাবনের খবর সম্পর্কে–যাতে বহু লোক মারা যায় ও আরও অনেক লোক গৃহহীন হয়ে পড়ে–অবগত ছিল না। কিন্তু এখন তারা সাথে সাথে এ ধরনের খবর জানতে পারে এবং এ কারণে দুঃখ অনুভব করে ও উদ্বিগ্ন হয়। বিশ্বের বিভিন্ন অংশে এ ধরনের হাজার হাজার দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে।

এটা মানবিক কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশিত একটি অভিমত; মানবিক কল্যাণের মানদণ্ড থেকেই অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি গতির দ্রুতায়ন আদৌ উন্নতি বা বিকাশের পরিচায়ক কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

সে যা-ই হোক, এ সব সমস্যার ব্যাপারে আমাদের কোন করণীয় নেই। কারণ, আমরা মনে করি যে, সার্বিকভাবে একটি বিকাশ সংঘটিত হচ্ছে এবং এ সব সমস্যাকে অতিক্রম করা সম্ভব। এ ব্যাপারে আমরা পরে আলোচনা করব।

মোদ্দা কথা, যন্ত্রপাতি, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও অন্যান্য বস্তুগত উন্নতির ফলে মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনরূপ উন্নতি বা বিকাশ সাধিত হয়েছে এমন কথা আমরা বলতে পারি না এবং যদি হয়েও থাকে তাহলে সে উন্নতি বা বিকাশ যান্ত্রিক আবিষ্কার ও সামাজিক সংগঠনসমূহ গড়ে ওঠার সাথে সমান তালে তাল মিলিয়ে হয় নি।

স্বয়ং নিজের সাথে মানুষের সম্পর্ক

আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে স্বয়ং নিজের সাথে মানুষের সম্পর্ক–যাকে নৈতিকতা বলে অভিহিত করা হয়। যদি আমরা বলতে না চাই যে, মানুষের পুরা সুখশান্তি তার নিজের সাথে একটি উত্তম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ওপর নির্ভরশীল (আর আসলেও আমরা তা বলছি না। কারণ, তা হবে অতিকথন বা বাড়াবাড়ি), তাহলে আমরা বলতে পারি, মানুষের সুখশান্তির উপকরণগুলোকে তার সুখশান্তিতে ভূমিকা পালনের দৃষ্টিতে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

শতকরা হারে পরস্পরের সাথে তুলনা করলে নিঃসন্দেহে দেখা যায় যে, এ সুখশান্তির বৃহত্তর অংশই তার নিজের সাথে সম্পর্ক–অন্য কথায়, তার নাফ্স-এর বা তার প্রাণীসত্তার সাথে সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। কারণ, মানুষের মানবিক সত্তা ও তার প্রকৃতিতে নিহিত মানবিক মূল্যবোধ সমূহের পাশাপাশি সে একটি প্রাণীও বটে। অর্থাৎ সে হচ্ছে একটি প্রাণী যার মধ্যে মানবিকতা প্রদান করা হয়েছে। অন্য কথায়, সে হচ্ছে একটি প্রাণী এবং সে তার প্রাণিসুলভ বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি মানবিকতারও অধিকারী।

এখন প্রশ্ন জাগে, মানুষের মানবিকতা কি তার প্রাণীসত্তার অধীন, নাকি তার প্রাণীসত্তা তার মানবিকতার অধীন?

কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

'যে তাকে (স্বীয় সত্তা বা নাফ্সকে) পরিশুদ্ধ করেছে সে সফলকাম হয়েছে এবং যে তাকে কলুষিত করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।'[৮]

এখানে সমস্যা হচ্ছে আত্মশুদ্ধির সমস্যা। এর মানে হচ্ছে, ব্যক্তি যেন তার নাফ্সের লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনা তথা প্রবৃত্তির হাতে বন্দী হয়ে না পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন মানুষ নৈতিকভাবে বিকাশপ্রাপ্ত ও উন্নত হবে এবং স্বীয় প্রাণীসত্তা বা পশুসত্তা থেকে অভ্যন্তরীণ মুক্তি হাসিল করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে অন্য মানুষের সাথে উত্তম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কেবল তখনই কারও পক্ষ থেকে উত্তম মানবিক সম্পর্ক উদ্ভূত হতে পারে যখন সে নিজেকে অন্য মানুষের কবলে বন্দী থাকা অবস্থা থেকে মুক্ত করে এবং অন্য মানুষকে নিজের অধীন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়।

এ পর্যন্ত আমরা চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। তা হচ্ছে :

১. প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক–যে ক্ষেত্রে সে অগ্রগতি হাসিল করেছে।

২. সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক–যে ক্ষেত্রে সমাজ কাঠামো ও সংগঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে সে অগ্রগতি হাসিল করেছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩. অন্য মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং অন্য মানুষের সাথে তার সম্পর্কের গুণগত অবস্থা–যে বিষয়টি তার আধ্যাত্মিকতার ওপর নির্ভরশীল এবং তার মানবিকতার মূল মর্মের সাথে সম্পৃক্ত। এ ক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে যে, সে অগ্রগতি হাসিল করছে কিনা। নিঃসন্দেহে এ ক্ষেত্রে তার অগ্রগতি তার অন্যান্য দিকের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এখানে মূল প্রশ্ন হচ্ছে, আদৌ সে অগ্রগতি হাসিল করেছে কিনা।

৪. মানুষের নিজের সাথে তার সম্পর্ক–যা নৈতিকতার শর্তাধীন।

ঐতিহাসিক বিকাশে নবিগণ ও ধর্মের ভূমিকা

অতীতের মানুষ তার প্রাণীসত্তা বা পাশবিক সত্তাকে যতখানি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল আজকের মানুষ কি তার চেয়ে বেশি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে এবং তার অস্তিত্বের ভিতরে কি উচ্চতর মানবিক মূল্যবোধসমূহ অর্জিত হয়েছে নাকি মানবিক অস্তিত্বের গুণগত বৈশিষ্ট্য অতীতে বর্তমানের চেয়ে উন্নততর ছিল? ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশে নবী-রাসূলগণের ভূমিকা এবং এ ব্যাপারে তাঁদের অতীত ও ভবিষ্যৎ ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট। এখানে আমরা অতীতে ধর্ম কী ভূমিকা পালন করেছে তা উদ্ঘাটন করতে পারি এবং তা থেকে এর ভবিষ্যৎ ভূমিকা সম্বন্ধেও ধারণা লাভ করতে পারি। বৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা অনুমান করতে পারি যে, মানুষের ভবিষ্যৎ বিকাশের জন্য ধর্মের প্রয়োজন আছে কিনা। কারণ, প্রত্যেক মানুষের টিকে থাকা ও বিলুপ্ত হওয়া তার মানবিক প্রয়োজন পূরণ হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। এ তত্ত্বটি কুরআন মজীদে বিবৃত হয়েছে এবং বিজ্ঞানও তা স্বীকার করেছে। কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে :

...فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَ أَمَّا مَا يَنْفَعُ النَاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ...

...'অতএব, ফেনা শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং যা কিছু মানুষের জন্য কল্যাণকর তা ধরণীর বুকে অবশিষ্ট থেকে যায়...।'[৯]

একটি উপমা আছে যা আমি আমার বিভিন্ন বক্তৃতায় বহু বার উল্লেখ করেছি। তা হচ্ছে প্লাবন ও পানির ওপরের ফেনা। এ উপমায় বলা হয়েছে যে, ফেনা অত্যন্ত দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যায় কিন্তু পানি থেকে যায়। সঠিক ও ভুলকে পানি ও ফেনার সাথে তুলনা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করা হয়; যা কিছু কল্যাণকর তা থেকে যায় এবং যা কিছু অর্থহীন তা তিরোহিত হয়ে যায়।

ভবিষ্যতে ধর্ম টিকে থাকবে কিনা তা নির্ভর করে মানবিক বিকাশে অর্থাৎ তার অভ্যন্তরীণ মূল সত্তার বিকাশ, তার আধ্যাত্মিকতা ও মানবিকতার বিকাশ এবং তার নিজের সাথে ও অন্য মানুষের সাথে তার সম্পর্কের বিকাশের ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকার ওপর। আর এটা এমন একটি বিষয় যাকে অন্য কোন কিছু দ্বারা না বর্তমানে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব, না ভবিষ্যতে।

এমতাবস্থায় প্রশ্ন জাগে, ভবিষ্যতে কি সম্মিলিত আত্মহত্যার পরিণামে মানবসমাজ বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং মানব প্রজাতি ধরণীর বুক থেকে মুছে যাবে, অথবা মানবসমাজ তার প্রকৃত লক্ষ্য খুঁজে পাবে– যা হবে একটি সর্বাত্মক বিকাশ (প্রকৃতির সাথে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিকাশ এবং সচেতনতার বিচারে, শক্তির বিচারে, মুক্তির বিচারে, ভাবাবেগের দিক থেকে ও অন্যান্য মানবিক অনুভূতির দিক থেকে বিকাশ)? আমরা মনে করি, এ বিকাশ অর্জিত হবে। আর আমাদের এ দৃঢ় বিশ্বাসের উৎস হচ্ছে আমাদের দীনী শিক্ষা।

ইতঃপূর্বে আমি আমার 'মানবজীবনে জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় সহায়তা' শীর্ষক এক বক্তৃতায় বলেছি যে, মানবতার ভবিষ্যৎ ও মানবিক বিকাশ এবং চূড়ান্ত ধ্বংসের প্রান্তসীমায় পৌঁছা থেকে মানব প্রজাতিকে রক্ষা করা একমাত্র ধর্ম ছাড়া অন্য কোন কিছুর পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল মানবজীবনে ধর্মের ভূমিকাই মানুষের অস্তিত্বে নিহিত মূল মানবিক সত্তার বিকাশের নিশ্চয়তা বিধান করতে সক্ষম।

তথ্যসূত্র

১. সূরা আল্ ক্বালাম-এর ১ম আয়াত। আয়াতটি হচ্ছে : ن وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطَرُوْنَ 'নূন; শপথ কলমের এবং সেসব জিনিসের যেগুলো লেখার কাজ করে।' লক্ষণীয়, এ আয়াতে 'যেগুলো লেখার কাজ করে' উল্লেখের মাধ্যমে কুরআন নাযিলের পরবর্তীকালে কলম বহির্ভূত লেখার উপকরণাদি (যেমন টাইপ-রাইটার ও কম্পিউটার) আবিষ্কার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে– যা ইতোমধ্যেই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে।– বাংলা অনুবাদক

২. সূরা আল্-'আলাক্ব : ১-৫।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩. সূরা আল্-মায়েদাহ্ : ৩ ।

৪. এটি পুস্তকটির নামের অনুবাদ মাত্র ।– বাংলা অনুবাদক

৫. বাদা' শব্দটির আভিধানিক তাৎপর্য হচ্ছে প্রকাশিত হওয়া । একজন মানুষের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য হচ্ছে : কোন কাজ সম্পর্কে মানুষের মনে এমন কোন ধারণার উদ্ভব হওয়া যে সম্পর্কে সে ইতঃপূর্বে অবগত ছিল না এবং তা তার মনে এমনভাবে জাগ্রত হয় যে, তা সংশ্লিষ্ট কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকে প্রভাবিত করে । অর্থাৎ এমন কিছু ঘটে যা ঐ কাজ সম্পর্কে তার ধারণা ও ইচ্ছাকে পরিবর্তিত করে দেয় । নিঃসন্দেহে মানুষের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তে এ ধরনের পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে তার অজ্ঞতা অথবা তার জ্ঞান ও ধারণার সীমাবদ্ধতা । এ অর্থে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রে বাদা' একটি অসম্ভব ব্যাপার । কারণ, সাধারণ মানুষের মত ঐশী ইচ্ছায় পরিবর্তন ও প্রতিস্থাপনের প্রশ্নই ওঠে না ।

৬. দক্ষিণ ইরানের একটি শহর ।

৭. ইরানের একটি শহর ।

৮. সূরা আশ্-শাম্স্ : ৮-১০ ।

৯. সূরা আর্-রা'দ্ : ১৭ ।

(তেহরান থেকে প্রকাশিত Al-Tawhid সাময়িকীতে মুদ্রিত ড. আলাউদ্দীন পাসার্গাদী কৃত ইংরেজি অনুবাদ হতে)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমা ষড়যন্ত্র : ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ

Jamiu Adewumi Oluwatoki

অনুবাদ : এস.এম. আশেক ইয়ামিন

ভূমিকা

কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম রক্ষাকারী, অভিভাবক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা বাকারা : ২৫৭, সূরা আলে ইমরান : ১৫০)। বর্তমান বিশ্বে ইসলাম অবরুদ্ধ অবস্থায় নিপতিত। অবরোধ একটি যুদ্ধ কৌশল–এক ধরনের অপরাধ ও আক্রমণ। যুদ্ধের মঞ্চে কৌশল ও কর্মপন্থার দিক থেকে অবরোধের অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ বন্দীদশা। এটি এমন একটি শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থা যেখানে সবকিছু প্রবেশের বা বহির্গমনের পথ রুদ্ধ। আর এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুর ধ্বংস সাধন যতক্ষণ পর্যন্ত তার সমরনায়ক বা ঘেরাওকৃত এলাকা বা তার জনসাধারণ আত্মসমর্পণে প্রস্তুত না হয়। সেক্ষেত্রে হয় তাদেরকে দাসে পরিণত করা হয় অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। আর অবরুদ্ধ অধিবাসীদের জন্য একমাত্র যে বিকল্প পথ খোলা থাকে তা হচ্ছে প্রতি আক্রমণ। সেটি একটি ভয়ানক পরিস্থিতি।

আপাতদৃষ্টিতে দুর্দমনীয় একটি শক্তি অবরুদ্ধ করে রাখার কাজটি করে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শত্রু একাধিক হয়ে থাকে এবং তারা একত্র হয়ে বিভিন্ন চেহারায়

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আবির্ভূত হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্র বা এ সব রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীগুলো তাদের একক শত্রু বিনাশ অথবা সেই শক্তিকে প্রশমিত ও তার বিপদাশংকা হ্রাসের আকাঙ্ক্ষায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাই ষড়যন্ত্র হচ্ছে একটি কৌশল; কোন ভূখণ্ডে বাস্তবায়নের জন্য একটি পূর্বধারণকৃত পরিকল্পনা, যা যুদ্ধকে বাস্তব রূপদানের একটি কর্মপন্থা। সুতরাং যদি কোন যুদ্ধক্ষেত্রে অবরোধের ঘটনা ঘটে, সেক্ষেত্রে তা একটি কর্মপন্থা (Tactics) এবং অবরোধকারী সেনাবাহিনীসমূহের সদর দফতর কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রটি হচ্ছে কৌশল (Strategy)। Clausewitzian ঐতিহ্য অনুসারে 'সশস্ত্র লড়াই হচ্ছে যুদ্ধের কোলে জন্ম নেয়া প্রথম সন্তান যা শত্রুবাহিনীর ধ্বংস সাধনের প্রচেষ্টায় সংকটের রক্তস্নাত সমাধান' (O Sullivan and Miller jr. 198 : 52)।

এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ হচ্ছে Clausewitzian এর নিজের ভাষায় : 'রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপায় অবলম্বন।'

কৌশলগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এ ধরনের আকস্মিক পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের বর্তমান সমস্যার গুরুত্বকে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করা। আমরা যদি সম্মত হই যে, ইসলাম এখন অবরুদ্ধ তাহলে আমাদের এ ব্যাপারেও সম্মতি জ্ঞাপন করতে হয় যে, আমরা এক ধরনের যুদ্ধের পরিস্থিতির ভিতর অবস্থান করছি। আর যদি এক্ষেত্রে কোন ষড়যন্ত্র কার্যকর থাকে, তার অর্থ হচ্ছে আমাদের শত্রু এক নয়, একাধিক এবং তাদের পন্থাও হবে বহুমুখি।

এক্ষেত্রে পরবর্তী যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তা হচ্ছে এ শত্রুরা কারা? ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমা ষড়যন্ত্রকারীরা কারা? কী তাদের উদ্দেশ্য? ইসলাম কোন্ স্বার্থ অথবা স্বার্থসমূহের ক্ষেত্রে আশংকার সৃষ্টি যা এ ধরনের জোটবদ্ধতার সৃষ্টি করে? এ ধরনের ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে কী উপায় অবলম্বন করা হয় এবং কীরূপে তারা তাদের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটায়? এ অবরোধের তাৎপর্যই বা কী? ইসলাম কি এ অবরোধ অপসারণে সক্ষম? এক কথায়, যদি ইসলাম আক্রমণের শিকার হয়ে থাকে, তাহলে এর অর্থ হচ্ছে ইসলাম সেক্ষেত্রে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে রয়েছে। তাহলে এ অবরোধ (আক্রমণ) অপসারণে কোন্ যুদ্ধকৌশল প্রয়োজন? ইসলাম কি সঠিক কাজটি সঠিক উপায়ে সম্পাদন করছে? ইসলাম কি এ অনিশ্চিত অবস্থাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করে? এ অবস্থায় সমকালীন প্রজন্ম এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ কারা?

এ বিষয়গুলোই এখানে আমাদের আলোচ্য।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১. পরিস্থিতি

ফ্রেঞ্চ জেনারেল নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এক সময় বলেছিলেন, স্রষ্টা উন্নত সেনাবাহিনীর পক্ষাবলম্বন করেন। আজকে ইসলামের অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার বিষয়টি আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি? ঐতিহাসিকভাবে, কুরআন যেভাবে ঘোষণা করেছে– 'ইসলামের আগমনে সত্য প্রকাশিত হয়েছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, যেমনটি হওয়ার কথা ছিল' (কুরআন ৩ : ৮০)। বিভিন্ন দেশ ও ভূখণ্ডে ইসলামের অভাবিত বিজয় সময়ের সাথে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন এলাকায় এমন এক শত্রুর নিকট পরাজয়ে পর্যবসিত হয় যারা ইতিপূর্বে মুসলমানদের শৌর্য ও সাহসিকতার সম্মুখে নতি স্বীকার করেছিল। নবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পরপরই মধ্য ৭ম শতাব্দীতে যখন আরবের মুসলমানরা বড় বড় দলে সামরিক অভিযানে বেরিয়ে পড়ে, তখন তা সমগ্র বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। বড় বড় সাম্রাজ্য মুসলমান সৈন্যবাহিনীর তোড়ে একের পর এক ধসে পড়তে লাগল পারস্যে (কাদিসিয়া ৬৩৫, মেসিকন ৬৩৭), ক্যালডী এবং মেসোপটেমিয়ায় ৬৩৫), মিশরে (আলেকজান্দ্রিয়া ৬৪১) এবং উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় (কায়রাওয়ান ৬৭০, পশ্চিম আফ্রিকা ৭০৪-৭১১, স্পেন, ৭১১)। এ সকল ও অন্যান্য স্থানে ইসলামের বিজয় মুসলিম শাসন ও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। প্রফেসর গিব এর ভাষায়, ইসলামের সম্প্রসারণ জনগোষ্ঠীসমূহ এবং তাদের সংস্কৃতিকে নতুন এক একত্রীকরণের দিকে পরিচালিত করে (Gibb 1975 : 3)।

অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ইসলামী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে ফাটল পরিদৃষ্ট হয়। সিফ্ফিনের যুদ্ধ শুরুর মধ্য দিয়ে (মনে হচ্ছে এক্ষেত্রে যে সামরিক উপমা রয়েছে তা এড়িয়ে যাওয়া দুষ্কর)। সিফ্ফিন দ্বন্দ্বের একটি প্রতীকীরূপ (যেমনটি মালেক বেন্নাবী বলেছেন, এর একদিকে কুরআনী চেতনার প্রতিনিধিত্বকারী ইমাম আলী (আ.) অপরদিকে নবী (সা.)-এর প্রধান শত্রু আবু সুফিয়ানের পুত্র, জাহেলীয়াতের প্রতিনিধিত্বকারী আমীর মুয়াবিয়া। যা-ই হোক না কেন, যখন মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে ইসলামী সভ্যতা বিকাশ লাভ করছিল, একই সময়ে প্রায় অদৃশ্য এক অভ্যন্তরীণ ক্ষত বিস্তার লাভ করছিল। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। পারস্পরিক বিরোধ, শত্রুতা এবং অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা বেড়ে উঠতে লাগল।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যে গতিশীল আহ্বানের প্রতি সাড়া প্রদান অন্যদের ওপর বিজয় এনে দিয়েছিল, মুসলমানদের দৃষ্টিসীমা থেকে তা অপসৃত হল। মুসলমানরা যেন তাদের কাজে কিছু দিনের জন্য ইস্তফা দিল। সমুদ্র যাত্রা মন্থর হয়ে এল, তারা তাদের অস্ত্রভাণ্ডারের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ল এবং তাদের শত্রুদের মেনে নিল।

সমাজবিজ্ঞানের জনক ইবনে খালদুনের ভাষায়, মুসলমানদের অবস্থা ছিল নিজেদের অর্জন উপভোগের বিলাসিতায় মগ্ন নিঃশেষিত শহুরে অধিবাসীদের মত, যতদিন না প্রাচীন উপজাতীয় সৈন্যবাহিনী তাদের ঘাড়ে এসে পড়ে। বহু শতাব্দী ধরে ইসলামকে এ সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়েছে। ১১শ' শতকের শেষভাগে খ্রিস্টীয় জগতের (পশ্চিমা খ্রিস্টান) ক্রুসেড্ মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিস্থাপনে প্রচণ্ড আক্রমণের সূচনা ঘটায়। তা ছিল হামলা ও অবরোধ যা সমগ্র খ্রিস্টীয় জগৎ দলবদ্ধ হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে কার্যকর করে। একজন মুসলিম সুলতান ও জেনারেলের ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রেই আমরা কেবল এ সংকটের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হই। পশ্চিমা হুমকি মোকাবিলায় মুসলমান জনসাধারণের তাদের নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে যে সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি লাভের প্রয়োজন ছিল তার সবটুকুই এ একজন মুসলমান নেতৃত্বের ভিতর খুঁজে পাওয়া যায়। লেন-পুল, সালাহ্উদ্দিন আল-আইউবির (Saladdin to the Christian West) কর্ম প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পশ্চিমের দুঃসাহসিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিবিধানের গুরুত্ব সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতাংশটি এ বিষয়কে আরও স্পষ্ট করে তুলবে : '১০৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ক্রুসেড তার পূর্বমুখি অভিযান শুরু করে, ১০৯৮তে এডেসা ও অ্যান্টিওক এবং আরও অনেক দুর্গ বিজিত হয়; ১০৯৯ সালে খ্রিস্টানরা স্বয়ং জেরুজালেমের অধিকার ফিরে পায়। পরবর্তী অল্প কয়েক বছরে ফিলিস্তিনের বৃহৎ অংশ এবং সিরিয়া, টরটোসা, আক্কা, ত্রিপোলি এবং সিডন (১১১০) এর উপকূলসমূহ ক্রুসেডারদের হস্তগত হয়, ১১১৪ খ্রিস্টাব্দে তায়ের বিজয় তাদের ক্ষমতার সর্বোচ্চ সাফল্যের সূচনা ঘটায়। এটি ছিল সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন ইউরোপ থেকে সফল আক্রমণ সম্ভবপর ছিল। এক প্রজন্ম পূর্বে সেলজুকদের ক্ষমতা ছিল দুর্ভেদ্য। পরবর্তী প্রজন্মে সিরিয়ায় জংগী অথবা নুরুদ্দীনের সেলজুকের স্থান দখল সম্ভবত আক্রমণকারীদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিল। কোন এক শুভক্ষণে প্রথম ক্রুসেডের প্রচারকরা এমন এক সুযোগ হস্তগত করতে সক্ষম হয় যার গুরুত্ব সম্পর্কে তারা নিজেরাই সেসময় অবগত ছিল না। পিটার, আরমিট এবং দ্বিতীয় আরবান যদি এশীয় রাজনীতির যথাযথ পাঠ নিতে পারতেন তাহলে তারা সে মাহেন্দ্রক্ষণকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বিচক্ষণতার সাথে সুনিশ্চিত বিজয় হিসাবে মনোনীত করতেন। কীলক যেমন নতুন ও পুরাতন কাঠ ফুঁড়ে ঢুকে যায়, ক্রুসেডও তেমনি করে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল যে, তা ইসলামী রাজত্বকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলবার ফাটলের সূচনা ঘটাবে।' (Lane-Poole 1968 : 163-164)

সালাহ্উদ্দিন আল-আইউবী থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে তাঁর বিভিন্ন সাহসী অনুসারীদের দ্বারা খ্রিস্টীয় সফলতার হিসাব উল্টে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ক্রুসেড (১১৩০) পরাজিত হয়, তৃতীয়টির (১১৮৯) পরাজয় আখ্যায়িত হয়েছিল অবরোধকারীদের ওপর অবরোধ হিসাবে, চিলড্রেন ক্রুসেড (১২১২) বিধ্বস্ত অবস্থায় শেষ হয়। হাঙ্গেরিয়ানদের পরিচালিত ক্রুসেড (১২১৭) ব্যর্থ হয়, এমনকি মহান ফ্রেডেরিকের ক্রুসেডটিও (১২২৪) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১২৩৯ খ্রিস্টাব্দে নাভারের রাজার নেতৃত্বের ক্রুসেডটি পরাজিত হয় এবং একইভাবে ফ্রান্সের রাজা নবম লুই এর ক্রুসেডেরও বিপর্যস্ত অবস্থায় পরিসমাপ্তি ঘটে (Lane-Poole 1968 : 163-165, 173, 174, 209, 211, 218, 225-231, 239, 256)।

মুসলমানরা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সুগভীর ও দৃঢ় সাফল্য অর্জন করেছিল খ্রিস্টীয় জগৎ কর্তৃক তা উপলব্ধি করতে পারা ছিল ক্রুসেডের এ ব্যাপক পতনের একটি কারণ। তারা মুসলমানদের কাছ থেকে ধার করা বিদ্যা শিক্ষাগ্রহণ করেছিল। পূর্বের সাথে পশ্চিমাদের যোগাযোগ খ্রিস্টীয় জগতকে তাদের নিজেদের উৎকর্ষ সাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে উৎসাহিত করে। রেনেসাঁর মত এত বড় ঘটনাও ইসলাম ও ইউরোপের সংযোগ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল (Izetbegovic 1999 : 143)।

এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, খ্রিস্টীয় জগৎ ইসলামের পতনের আশা পরিত্যাগ করছিল না। পশ্চিমা ক্রুসেডের পরাজয় পরবর্তী সময়ে ইসলাম একটি নির্জীব অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও ক্রুসেডারদের শেষ পরাজয়ের শতাব্দীতে অটোমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় (১২৯৯)। পরবর্তী শতাব্দীতে অটোমান সাম্রাজ্য প্রচণ্ড এক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কন্স্টান্টিনোপল বিজয়ের মধ্য দিয়ে অটোমান সাম্রাজ্য ইউরোপে ১৫শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের ভিতরে ইউরোপে তার অবস্থান সুদৃঢ় করে। প্রকৃতপক্ষে, অটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরবর্তী তিন শতাব্দীকালে (১৪শ থেকে ১৬শ শতাব্দী) তা 'ইউরোপের আতংক এবং সে সময়ের বিশ্বের বিদ্যমান সন্ত্রাস' হিসাবে আবির্ভূত হয় (Lewis 1974 : 198-199)।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইউরোপের কাছে তুর্কীরা 'অবিশ্বাসী তুর্কী' হিসাবে পরিগণিত হয় এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে শত্রুতার অগ্নি প্রজ্বলিত হতে থাকে। ইসলামি সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে পূর্বেও যেমনটি ঘটেছিল তেমনিভাবে অটোমান সাম্রাজ্যও শীঘ্রই তাদের কাজে কর্মে অবসর গ্রহণ করল। ভিতরে ভিতরে ক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তী তিন শতাব্দীতে (১৭শ থেকে ১৯শ শতক) মহান অটোমান সাম্রাজ্য একেবারেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এ পতনই চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশ শতকের প্রারম্ভে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তার পরাজয় ডেকে আনে। সুতরাং আন্তঃক্ষয় বহিঃআক্রমণ ডেকে এনেছিল (Oluwatoki 2001 : 29)।

এটা অবশ্যই স্মরণ রাখা দরকার যে, পাশ্চাত্য ইসলামের কাছে হেরে শিক্ষাগ্রহণ করেছিল। ইসলামের অর্জনগুলো দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তারা আত্মসচেতন হয়ে ওঠে এবং রেনেসাঁ ও আলোকপ্রাপ্তির সময়ের উন্মেষ ঘটায়। ধর্মের কর্তৃত্ব পরিত্যাগ এবং যুক্তিকে গ্রহণ করে নেয়ার যুগে (Age of Reasoning) এ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আবির্ভূত হয়।

এটা ছিল সেই পাশ্চাত্য ও সেই খ্রিস্টজগৎ যারা বিশ্বজয়ের জন্য সাম্রাজ্যবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। আর ১৯শ' শতাব্দীতে অটোমান সাম্রাজ্য তার অধঃপতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। ১৮৩০ সালের মধ্যে উপনিবেশবাদী ফ্রান্স আলজিয়ার্স দখল করে নেয় (Abun-Nasr 1973 : 311) এবং এর চূড়ান্ত পরিণতি ছিল বেলফোর ঘোষণা যা ইউরোপীয় ইহুদীদের (অথবা আরও যথার্থভাবে বর্ণবাদী যায়নবাদীদের) একটি জাতীয় আবাসন ব্যবস্থার জন্য ফিলিস্তিনকে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান করে। ১৯৪৮ সালে অবৈধ যায়নবাদী ইসরাইলের ঘোষণা দেওয়া হয় এবং তখন থেকেই ফিলিস্তিন প্রসঙ্গ আরব-ইসরাইল সংকটে রূপ নেয়। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং পরবর্তীকালে নব্য উপনিবেশবাদের মাধ্যমে ইসলামি বিশ্বকে খ্রিস্টীয় জগৎ কর্তৃক অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লাঞ্ছনার শিকার হয়ে এসেছে। এ সকল কিছুর সবচেয়ে বড় শিক্ষা এই যে, মুসলমানরা এমন এক অবস্থায় নিপতিত হয়েছে যা তাদেরকে ভঙ্গুর এক অবস্থানে নিয়ে এসেছে। মালেক বেন্নাবি যাকে 'Colonisibility' আখ্যা দিয়েছেন। অন্যভাবে বলা যায়, কোন জনসাধারণকে শুধু তখনই উপনিবেশ কবলিত করা সম্ভব যখন তারা নিজেরাই নিজেদের তেমন অবস্থানে নিয়ে যায়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২. ষড়যন্ত্র এবং তার পারস্পরিক সম্পর্ক

আমি নিশ্চিত যে, আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। যা বাকি রয়ে গেছে তা হল, এ ষড়যন্ত্রের বিবিধ রূপের পরিস্ফুটন। শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ সামরিক প্রচেষ্টা ছাড়াও ষড়যন্ত্রের আর যেসব প্রকাশ ঘটতে দেখা যায় তা নিম্নরূপ :

ক. শিক্ষা

উপনিবেশ স্থাপন করে পাশ্চাত্য তার শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলমানদের তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধারণের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে–যা কাজ করছে ইসলামি মূলনীতিকে গুরুত্বহীন এবং ইউরো-আমেরিকান ভাবধারার চর্চাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে। আর এ পথেই তারা মুসলিম দেশগুলোতে পাশ্চাত্যপন্থী কিছু এলিট গড়ে তুলেছে যারা মুসলিম ভূমিগুলোতে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করছে। যেমনটি বহু উপনিবেশে ঘটেছে। (এ শিক্ষা শুরু এবং শেষ হয়েছে তিনটি R দিয়ে : Writing, reading and arithmatic)

খ. আইনি ব্যবস্থা

পশ্চিমাদের অধীন মুসলিম ভূখণ্ডসমূহে ইসলামী বিধানসম্মত বিচার ও দণ্ডের বিলোপ এবং নিজস্ব ফৌজদারী বিধি আরোপের মাধ্যমে তারা ইসলামের আইনগত নীতিমালার বিনাশ ঘটাতে থাকে। তারা সর্বদাই অনিচ্ছাভরে দেওয়ানি ক্ষেত্রে ইসলামি বিধি প্রয়োগের অনুমতি প্রদান করেছে। মুসলমানদের জীবনে ইসলামের ব্যাপক প্রভাবকে নিষ্ক্রিয় করতেই পদ্ধতিগতভাবে ইসলামি বিধিবিধানের এ বিনাশ সাধন করা হয়। পাশ্চাত্য তার শিক্ষা এবং তার সভ্যতার ক্রমাগত চর্চা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাশ্চাতের যে কোন কিছুকে সর্বোত্তম হিসাবে উপস্থাপন করে। তাদের মানব-রচিত আইনকেই সকল অনিবার্য ত্রুটিসহই উচ্চমানসম্পন্ন হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। ইসলামি আইনের ওপর সাধারণ আইনকে তার সকল বৈপরীত্য এবং ক্ষমতার নির্লজ্জ সুরক্ষা বিধানের বৈশিষ্ট্যসহ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে চাপিয়ে দেওয়াতে যেসব সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে অনেক মুসলিম ভূখণ্ডে আজ তা দ্বন্দ্ব ও বিবাদের উৎস হিসাবে কাজ করছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

গ. আর্থিক অবস্থা

যেহেতু সাম্রাজ্যবাদের পরম লক্ষ্যই হচ্ছে পুঁজিবাদের বিকাশ উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা, তাই উপনিবেশিকরণ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত পর্যায়। এর মুখ্য চালিকাশক্তি হল বিশ্বের বিভিন্ন অংশকে বিশ্বপুঁজিবাদের অধীনে একত্র করা। সুদি কারবার এবং মুনাফাখোরি হল পুঁজিবাদের মূল বৈশিষ্ট্য যা ইসলামি আর্থিক ব্যবস্থায় অস্বীকৃত।

অলিগোপলিভিত্তিক (একাধিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একত্র হয়ে একচেটিয়া ব্যবসা) একচেটিয়া ব্যবসায় যুগের পর আমরা এখন বিশ্বায়নের যুগে অবস্থান করছি। যেখানে রাষ্ট্রসমূহের সীমান্তগুলোকে আন্তঃদেশীয় পুঁজির অনুপ্রবেশে সম্মতি প্রদানে বাধ্য করা হচ্ছে। আর এটি হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম অংশের সম্পদ ক্ষুদ্রতম জনগোষ্ঠীর হাতে কুক্ষিগত করার পশ্চিমা এলিট ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের একটি ষড়যন্ত্র।

AB Robinson দেখিয়েছেন যে, neo-liberalism এবং Polyarchi এর (আমেরিকার গণতন্ত্রের brand) দ্বন্দ্ব কীভাবে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের জন্য একটি স্থায়ী ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। ১৯৯২ সালের Human Development Report যথাযথভাবেই তা পরিস্ফুটিত করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে রিপোর্টটি দেখিয়েছে যে, বিশ্বের মাত্র ২০% জনগোষ্ঠী বিশ্বের সর্বমোট আয়ের ৮২.৭% লাভ করে এবং বিশ্বের দরিদ্রতম ২০% জনগোষ্ঠী বিশ্বের সর্বমোট আয়ের মাত্র ১.৪% পেয়ে থাকে। এ বিষয়টির প্রকটতা আবার যুক্ত হয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে নিজস্ব বর্ধনশীল যে বৈষম্য রয়েছে তার সাথে। কোন কিছুই ইসলামি সামাজিক সংগঠনকে এর চেয়ে অধিক অস্বীকৃতি জানায় না (Robinson 1996 : 340-341)।

অন্যদের মত মুসলমানরাও ক্ষতির শিকারে পরিণত হয়েছে। এটা বলা যথেষ্ট যে, এ অর্থনৈতিক নির্দেশনা ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে পশ্চিমা হস্তক্ষেপের ব্যাপারে জানান দেয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ্ব জুড়ে পাশ্চাত্য World Bank, International Monitory Fund এর মত Breton Wood সংস্থাগুলোর মাধ্যমে তাদের আর্থিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করার প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছে। আজ একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়ন তাদের চূড়ান্ত সাফল্য।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ঘ. তথ্য

রেডিও থেকে শুরু করে টেলিভিশন, সিনেমা, কম্পিউটার এবং এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি তথাকথিত বিশ্বপল্লীকে (Global Village) সফলতার সাথেই বিশ্বকক্ষে রূপান্তরিত করেছে। বিশ্বের দূর-দূরান্তের ঘটনা টেলিভিশনের মাধ্যমে মুহূর্তেই পরিবেশিত হচ্ছে। একইভাবে সকল ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক প্রভাব আপনার ও আপনার পরিবারের কাছে নির্বিঘ্নে পৌঁছে যাচ্ছে এবং যুগ যুগ ধরে চলে আসা মূল্যবোধ এবং প্রথাকে হুমকির সম্মুখীন করছে। আর গুরুত্বপূর্ণ রীতি-নীতি ও বিধানসমূহকে বিপন্ন করে তুলছে। এসব উপকরণের একটি বড় লক্ষ্যস্থল হল পোশাক-পরিচ্ছদ (বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে) এবং আরও অসংখ্য সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ যে বিষয়ে ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। যে হারে পাশ্চাত্য তরুণদের মাঝে, এমনকি সবার মাঝে অনৈতিকতা ছড়িয়ে দিচ্ছে তা খুবই উদ্বেগজনক। ট্যবলয়েডের পাঠক এবং টেলিভিশন ও সিনেমার দর্শক এবং ইন্টারনেটে বিচরণকারীরা বিনা বাধায় তাদের এমন এক ব্যবস্থার শিকারে পরিণত হচ্ছে যা সহিংসতা, পর্নোগ্রাফি, মদপান, জুয়ার মত আরও নানারকম ভয়ংকর সব নেতিবাচক প্রভাবের আধার। এসব কিছুই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যোগাযোগমাধ্যম তার গ্রাহককে এ ব্যাপারে অসহায় করে তুলেছে। যোগাযোগব্যবস্থা পাশ্চাত্যকে ইসলামের বিরুদ্ধে সংবাদ-যুদ্ধকে সম্ভবপর করেছে। বিশেষ করে বিশ্বাসের ওপর নেতিবাচক প্রতিবেদন প্রচারের ক্ষেত্রে। আমরা মৌলবাদ শব্দটিকে ইসলাম ও ইসলামি আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহারের বিষয়ে অবগত।

ঙ. নব্য উপনিবেশবাদ

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার নেতৃত্বে পাশ্চাত্যের দেশগুলো মুসলিম দেশসমূহে যেভাবে সম্ভব, তাদের নীতিমালার ক্ষেত্রে, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এবং মুসলিম জনগণের জীবনযাত্রায় প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে তাদের কর্তৃত্ব বজায় রেখে চলেছে। সৌদি-আমেরিকান সম্পর্ক এ বিষয়টিকে প্রতিভাত করে। যে কোন মুসলিম রাষ্ট্র যেখানে এ ইউরো-আমেরিকান কর্তৃত্বকে প্রতিরোধ করা হয়েছে, সেখানেই

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আক্রমণ, সামরিক বোমাবাজি, সরকার পরিবর্তন এবং অন্যান্য উপায়ে তার মোকাবিলা করা হয়েছে। অথবা সেসব রাষ্ট্র নেতিবাচক প্রচার-প্রচারণার শিকারে পরিণত হয়েছে। ইরান, ইরাক, মিশর, লিবিয়া, আফগানিস্তান তেমনই অল্পকিছু উদাহরণ যা বিষয়টিকে প্রতীয়মান করে।

চ. ফিলিস্তিন

পাশ্চাত্যের ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ফিলিস্তিন একটি অপরিহার্য বিষয় এবং তার দ্বিচারিতার ক্ষেত্রে একটি চিরস্থায়ী অজুহাত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ব্রিটেন (তখনকার বিশ্বে সবচেয়ে ক্ষমতাধর) তাদের অতিরিক্ত বোঝা অটোমান সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধের শর্তে আরবদের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। সে প্রতিশ্রুতি ফিলিস্তিনি আরবদের (মুসলমান ও খ্রিস্টান) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। একই সময়ে পাশ্চাত্যের দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ব্রিটেন ইউরোপীয় ইহুদীদের ফিলিস্তিনে একটি জাতীয় ইহুদী আবাস গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেয়। এটা ছিল ১৯১৭ সালের ঘটনা (এ কারণে ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণা দেওয়া হয়)। এটা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ প্রতিশ্রুতি ছিল ইহুদীদের প্রতি ইউরোপ তথা পাশ্চাত্যের অমানবিক আচরণের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদী আন্দোলনের ফলে আন্তর্জাতিক যায়নবাদীদের চাপের ফসল। তাই জুদীয়-খ্রিস্টীয় সভ্যতার অযোগ্যতা, খ্রিস্টীয় জগতের তার ভাইয়ের তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার প্রতিবিধান নিশ্চিতরূপেই ইসলাম, মুসলমান জনগণ ও তাদের অধিকার অস্বীকারের মাধ্যমে করা হয়েছে।

৩. ফলাফল ও কারণ

মুসলমান জনগণ ও তাদের ভূমির ওপর দু' শতাব্দীকালে কর্তৃত্ব এবং তাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ওপর আক্রমণ এক সুস্পষ্ট পরিণতি লাভ করে। মুসলমানরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। তারা পাশ্চাত্যের সাফল্যকে ভুলক্রমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ফল হিসাবে চিহ্নিত করে। তারা বস্তুবাদিতার প্রলোভন ও ফাঁদে আটকা পড়ে আছে, যা পাশ্চাত্য সভ্যতা বিনির্মাণের মূল দর্শন। তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ দ্বারা সুরক্ষিত অবাধ স্বাধীনতা ও উদার গণতন্ত্রের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, যা উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতির মাধ্যমে পুঁজিবাদী উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দান

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করে। মুসলমানরা তাদের ইসলামী সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি, সামরিক কৌশল, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক সংহতি এবং সামষ্টিক প্রচেষ্টার ব্যাপারে ইসলামি সভ্যতার ব্যাপক অর্জনগুলোর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করে। আরও বিপর্যয়কর হল, ইসলামের বৈশ্বিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্য-প্রচারিত জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কাছে তাদের অসহায় সম্মতি জ্ঞাপন। এ এক চরম পরিণতি এবং তা মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করে তাদের শক্তির উৎসকে এমনভাবে নিঃশেষিত করেছে যে, তাদের কী করা উচিত তা তারা বুঝে উঠতে পারছে না।

এতদসত্ত্বেও অবস্থা এতটাই গুরুতর যে, মুসলমানদের তাদের নিজেদের স্বার্থেই মহান আল্লাহ্‌র রাহে জাগ্রত হতে হবে। মুসলমানদের তাদের দায়িত্ব পালনে জেগে উঠতে হবে যাতে তারা তাদের নিজেদের আশ্রয়গুলো ভয়ানক আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। আর এ উদ্দেশ্যে সকল ক্ষেত্রেই ক্রিয়াশীল হওয়া উচিত। সকল মুসলিম ভূ-খণ্ডে তার ব্যবস্থা এমন নীতিমালা দ্বারা সচেতনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যা সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত মুসলিম নাগরিক গড়ে তুলবে যারা মহান আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। শিক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক আচরণ শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তা খুবই মৌলিক একটি উপাদান। শিক্ষার মাধ্যমে একটি জাতির সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ তার পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। যে জাতি শিক্ষাকে অবহেলা করে এবং সমাজে যে কোন ধরনের মতের প্রচার অনুমোদন করে তারা আসলে এক মহাবিপদে পতিত হয়। মুসলমানরা নিজেদের জন্য হতাশার অনুমোদন দিতে পারে না। ইসলাম সবসময়ই শিক্ষাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। আমাদের যুব সম্প্রদায়ের শিক্ষার বিষয়টি আমাদের শত্রুর হাতে ছেড়ে দিয়ে বর্তমান প্রজন্মকে আমরা অসতর্ক ও অমনোযোগী হিসাবে গড়ে তুলছি।

সকল মুসলিম ভূ-খণ্ডে মুসলিম আইনকে সর্বোচ্চ আইন হিসাবে দৃঢ় করা উচিত। তবে, এক্ষেত্রে নাইজেরিয়ার মত দেশসমূহ যেখানে জনগণের বৃহদাংশ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও খ্রিস্টান সদস্যদের মাঝে কঠোর ইসলামবিরোধী মনোভাব বিদ্যমান সেক্ষেত্রে সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা যতক্ষণ পর্যন্ত না সংবিধানের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সীমারেখার মধ্যে থেকেই তাদের নিজেদের আইনি ব্যবস্থার অধিকার অর্জন করছে, আমরা আমাদের সংগ্রামে ক্ষান্তি দিতে পারি না।

মুসলমানদের তাদের নিজস্ব ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাদের সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনার উদাহরণ স্থাপন করতে হবে। ইসলাম ও মুসলমানদের তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধাসমূহ অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। প্রত্যেক মুসলমানকেই কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সক্রিয়ভাবে তথ্যপ্রযুক্তির গতিশীল জগতে অংশগ্রহণ করতে হবে। সাইবার জগৎ সকলের জন্যই উন্মুক্ত। মুসলমানদের উচিত ইসলামি উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নেওয়া। ইসলামি ধ্যান-ধারণা ও আদর্শ প্রচার এবং ইসলামি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রসারে এর সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো। মুসলমানদের বুদ্ধিদীপ্ত ও সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত। আর তা করা উচিত জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন এবং ইসলামী বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা যে সম্ভবপর তা সকলের সামনে উপস্থাপনের মানসিকতা নিয়ে। যে কোন পরিস্থিতিতেই মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটাতে হবে যাতে নব্য উপনিবেশবাদের অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলোকে এবং বর্তমান বিশ্বের ফ্যাশনে পরিণত হওয়া প্রশ্নোবোধক Promotion of Democracy কে রুখে দেওয়া যায়। এ কথা বলে কোন লাভ নেই যে, যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে তার তথাকথিত গণতন্ত্রের সংবর্ধনে বহুমতের (Polyarchy) প্রসার ঘটিয়ে যাচ্ছে (Robinson : 1996)।

ফিলিস্তিনি আরবদের পৃষ্ঠপোষকতা দানে মুসলমানদের অপরিহার্য এক দায় রয়ে গেছে– যারা পাশ্চাত্য সমর্থিত এবং পাশ্চাত্য-মদদপুষ্ট যায়নবাদীদের অধীনে ১৯১৭ সাল থেকে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। এটি এমন এক সমস্যা যা আমরা কেবল আমাদের আরব ভাইদের ওপর ছেড়ে দিতে পারি না। তারা ইতোমধ্যেই বহু ধারায় বিভক্ত। পাশ্চাত্য এক্ষেত্রে আরব প্রতিরোধের ওপর একটি শক্ত পেরেক গেঁথে দিয়েছে। এতদ্ব্যতীত এক উম্মাহ্ হিসাবে বিশ্বের সকল মুসলমানেরই ফিলিস্তিন প্রশ্নে কিছু করার দায়িত্ব রয়েছে। আর তা অবশ্যই করতে হবে। যদি সকল মুসলিম ভূ-খণ্ডের সকল মুসলমান তাদের স্ব-স্ব সরকারকে অবহিত করে যে, ফিলিস্তিন প্রশ্নে তারা প্রকৃত অর্থেই গুরুত্বারোপ করছে তাহলে এসব সরকারও এ বিষয়কে তাদের পররাষ্ট্র নীতিতে বিবেচনায় আনবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উপসংহার

আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের সামরিক শিক্ষা, আইনগত, আর্থিক, তথ্য এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। মুসলমান হিসাবে আমাদের মর্যাদা পুনরুদ্ধার এবং যে অবরোধ আমাদের সকল দিক বেষ্টন করে চেপে বসে আছে তার অবসান কল্পে এসব সমস্যার সমাধানও উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। আমাদের পূর্বে সালাহ্উদ্দিন আল-আইউবির মত আমাদেরও যা প্রয়োজন তা হল 'অবরোধকারীদের ওপর অবরোধ'। এর মাধ্যমেই আমরা বিজয় অর্জন করব এবং আমাদের স্বাধীনতা ফিরে পাব। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন আন্তরিক প্রচেষ্টা, দৃঢ় সংকল্প এবং অধ্যবসায়। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, 'আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে'। একইভাবে 'আল্লাহ্ কোন জাতির প্রতি তিনি যে অনুগহ করেছেন তা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তা পরিবর্তন করে।' (কুরআন ৮ : ৫৩)

তথ্যসূত্র :

1. Abun-Nasr, Jamal. **A History of the Maghrib**. Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
2. Ali, Abdallah Yousuf. **The Glorious Kur'an: Text, Translation and Commentary**. Beirut, Dar al-Fikr, n.d.
3. Asad Muhammad. **Islam and Western Civilization**. n.p,n.p,n.d.
4. Bennabi, Malek. **Islam in History and Society** (Trans. from French and Annotated by Asma Rashid). Islamabad, Islamic Research Institute, 1988.
5. Clausewitz, Otto von. **On War**. In Hutchins, Robert M. and Adler, Mortimer J; (Eds.) **Gateway to the Great Books**. vol 7., **Man and Society**. Chicago, William Benton, 1963.
6. Gibb, H.A.R. **Islam: A Historical Survey** (2nd Edition). Oxford, Oxford University Press, 1975.
7. Hitti, Philip K. **History of the Arabs from the Ancient Times to the Present** (10th Edition). London: Longman, 1973.
8. lzetbegovic, A.A. **Islam Between East and West**. Indianapolis, American Trust Publications, 1999.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

9. Lane-Poole, Stanley. **A History of Egypt in the Middle Ages**. London, Frank Cass, 1968.
10. Lewis, Bemard, **War and Politics** in Schacht, Joseph with Bosworth, C.E. (Ed.), **The Legacy of Islam**. Oxford, The Clarendon Press, 1974.
11. Lewis, Bemard. **The Arabs in History**. London. Hutchison University Library, 1966.
12. Oluwatoki, Abu Sayf J.A. **Islam, the West and Terrorism**. Ado-Ekiti, Idris Oluwatoki Islamic Foundation, 2001.
13. Oluwatoki, J.A., "Institutions and State Building: An Overview of the Asiatic Ottoman Civilization." **In AI-Hadarah: LASU Journal of Arabic and Islamic Studies**. vol. 4, June, 2001.
14. O'Sullivan, Patrick and Miller Jr., Jesse W. **The Geography of Warfare**. London, Croom Helm, 1983.
15. Robinson, William I. **Promoting polyarchy: Globalization, US Intervention, and Hegemony.** Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

(তেহরান থেকে প্রকাশিত ইকো অব ইসলাম, স্প্রিং ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 'The Conspiracy of The West Against Islam : Historical Perspective' প্রবন্ধের অনুবাদ)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com